প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৪১৪
মার্চ ২০০৮

ত্রৈমাসিক

এবং

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা

1st Issue, March 2008
Price: 20/- Tk.

Quarterly Abong
Art-Literature-Culture

'এবঙ' পত্রিকার অগ্রযাত্রা সফল হোক এই কামনায়...
গ্রেটার রোড, বর্ণালীর পার্শ্বে, রাজশাহী
আধুনিক ও রুচিশীল ফার্নিচার'র সম্ভার
01711104290
01558340295
আলমিরা
almira
Art & Furniture

'এবঙ' এর ১ম প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই ॥
বনফুল
অভিজাত মিষ্টি বিপনী
বিশুদ্ধ টাটকা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার বনফুল খাবার হোক নিত্যদিনের সঙ্গী সবার
আমাদের বিপনী থেকে আপনার পছন্দের মিষ্টি ও দই আজই বেছে নিন
- প্রধান কার্যালয়ঃ সাহেব বাজার জিরো পয়েন্ট, বড় মসজিদের উত্তর পার্শ্বে, রাজশাহী।
ফোন-৭৭১০৯৫
- দ্বিতীয় শাখাঃ লক্ষীপুর মোড়, মিন্টু চত্বর, রাজশাহী।
ফোন-৮১১৫৬২
- তৃতীয় শাখাঃ বিনোদপুর বাজার, বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, রাজশাহী।
ফোন-৭৫১১১৭

'এবঙ' এর পথচলা সফল হোক...
মেসার্স কমলা ফার্মেসী
লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
নায্য মূল্যে দেশী বিদেশী ঔষধ বিক্রেতা

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো,
একুশে ফেব্রুয়ারী...

'এবঙ' এর পথচলা শুভ হোক...

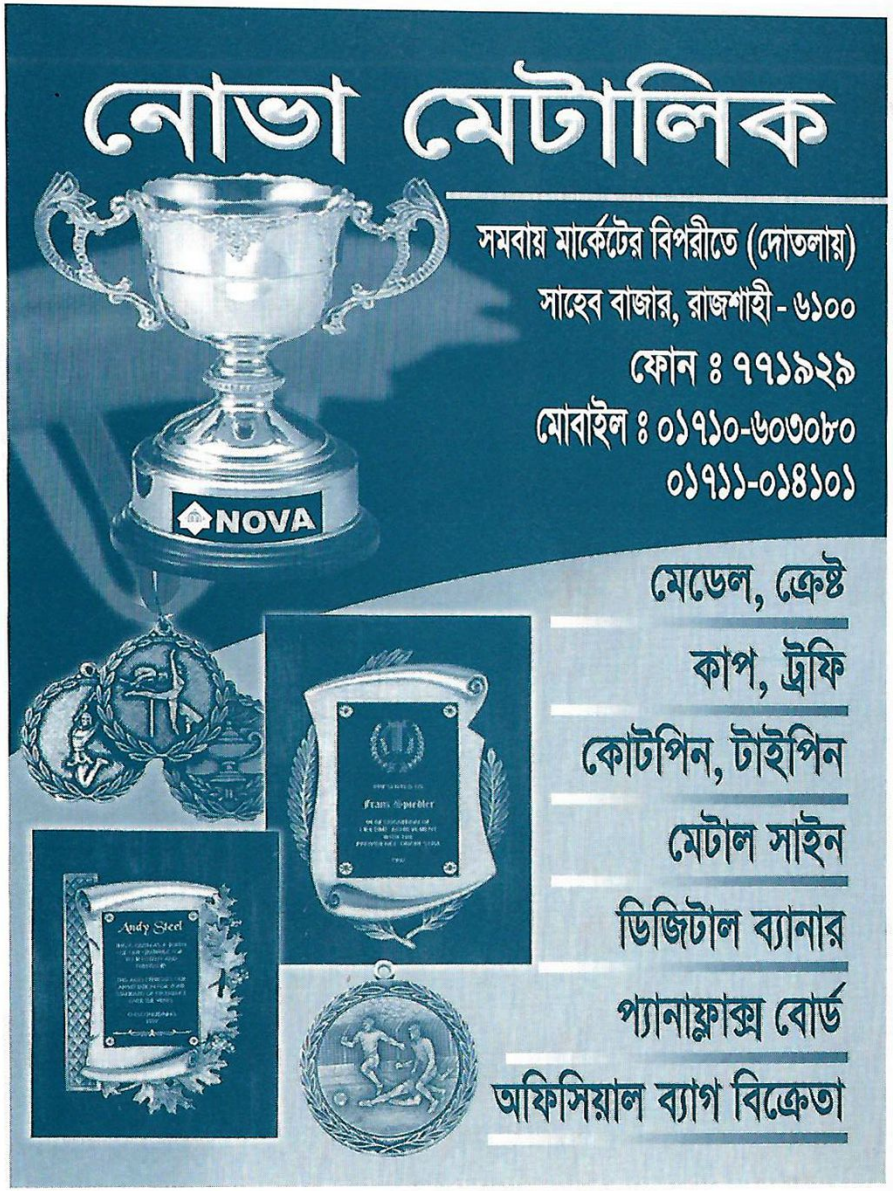

সম্পাদক
হীরা সোবাহান

সহ-সম্পাদক
আমিনূল ইসলাম

প্রকাশক
সরকার রুমানা

সমন্বয়কারী
মেহেদী হাসান

প্রকাশনা সহকারী
তারেক ইকবাল

শিল্প নির্দেশনা ও
কম্পিউটার গ্রাফিক্স
মামুনুর রশিদ

ত্রৈমাসিক এবঙ

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা
ফাল্গুন ১৪১৪ : মার্চ ২০০৮

মার্চ মাস বাঙালি জাতির স্বাধীনতা অধিকার অর্জনের আর্ত চিৎকার; এই মাস পরাধীনতার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর বলিয়ান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে শিল্প–সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা "এবঙ" এর প্রারম্ভিক যাত্রা শুরু করছি। এই সুদীর্ঘ পথচলায় আপনাদের সাহচার্য আমাদের অগ্রযাত্রাকে সমৃদ্ধ করবে বলে আশা রাখি।

সম্পাদক

প্রবন্ধ
৩ কবি ও নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ ◆ ড. গুলনাহার বেগম
৫ ব্রহ্মপুত্রের বরপুত্র শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ◆ স্বপন ধর
৯ এক উত্তরাধিকারের উজান যাত্রা ◆ ড. জোসী চৌধুরী

ছোটগল্প
১২ যার যে ক্ষমতা ◆ রুবেল রাজা
১৪ সময়ের আকাঙ্খা ◆ মোঃ জিল্লুর রহমান

জন্মদিনের শ্রদ্ধাঞ্জলি
১৫ হাসান আজিজুল হক: জীবন্ত কিংবদন্তি ◆ শিবলী নোমান

প্রদর্শনী
১৭ বিমূর্তনের পরিধি অনুভব ◆ মইনুদ্দীন খালেদ
১৮ ধূলোমাখা আদুল গায়ের স্মৃতি তাড়না ◆ জাহিদ মুস্তাফা
১৯ অন্ধকার নর্দমা শিল্প ◆ তাসনিম চৌধুরী

শিল্পকথন
২০ স্থাপনাশিল্প:প্রেক্ষিত বাংলাদেশ ◆ মনির উদ্দীন আহাম্মেদ টভেল

তথ্যচিত্র
২২-২৩ তথ্য সংগ্রহ: সুজন সেন ও মহুয়া

কবিতা
২৪-২৬ শিরোনামহীন ◆ সিদ্ধার্থ তালুকদার
মোনালিসা ◆ মাসুদ চৌধুরী, তিনটি কবিতা ◆ হীরা সোবাহান
আত্মদহন ◆ গোলাম ফারুক বেবুল, সময়ের প্রার্থনা ◆ লগন
লাল দাসী, অনুভবের চাঁদ ◆ অন্তরীক্ষ, একইভাবে ◆ রাজু
সরদার, যখন তুমি এবং রাত্রী ◆ স্বাধীন, সহজাত ◆ মাহবুবুল
ইসলাম, সিডর ◆ মোঃ হাবিবুল্লাহ

শ্রদ্ধাঞ্জলি
২৭ দেবদাস চক্রবর্তীর বর্ণিল আলাপ ◆ মইনুদ্দীন খালেদ
২৯ নাট্যকার সেলিম আল দীনের নাটকীয় প্রস্থান ◆ মাসুদ চৌধুরী

সাক্ষাৎকার
৩০ ভাষা সৈনিক এ্যাড. আব্দুর রাজ্জাক
অনুলিখন: রফি আহমেদ

গ্যালারী
৩১ লাফিজা নাজমীন

কার্টুনচিত্র
৩২ আঁকা: বিপ্লব দত্ত ও লেখা: মামুন

'এবঙ' পাবলিকেশন এর পক্ষে সরকার রুমানা কর্তৃক
২৬/১২২, মেহেরচন্ডী পূর্ব পাড়া (বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন সংলগ্ন), রাজশাহী থেকে প্রকাশিত।

প্রচ্ছদ-পরিচয়

সমুদ্রে দূর্গ

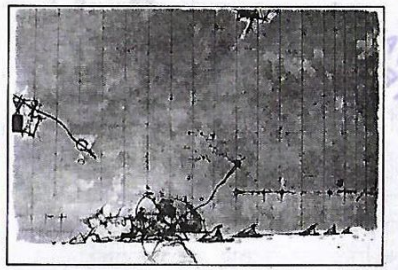

কাব্যিকতায় পরিপূর্ণ স্পেন প্রবাসী শিল্পী মনিরের চিত্র-সম্ভার। তিন দশকের বেশি সময় ধরে স্পেনের মাদ্রিদে বসবাস করলেও তাঁর শিল্পকর্মে দেশজ ঐতিহ্য ও বৈদেশিক শিল্পধারার সংমিশ্রণে এক নতুন মাত্রা যোজন লক্ষ্যণীয়। রঙ ও রেখার সুষম বিভাজনের সমন্বয় সাধন করে কাব্যিক চিত্র নির্মাণে একজন দক্ষ শিল্পীর পরিচয় মেলে। চিত্রকলার নানা মাধ্যমে শিল্পচর্চা করলেও তিনি মূলতঃ ছাপচিত্রকলা মাধ্যমেই চিত্র রচনায় সিদ্ধহস্ত। বিশেষত্ব এচিং মাধ্যমে নানা রকম করণ-কৌশল প্রক্রিয়ায় তাম্রতক্ষণে এসিড ও পানির বিক্রিয়ায় জল রঙের স্বচ্ছ অবয়ব সৃষ্টি করে এবং নানান রঙের প্রলেপে সাদা কাগজে ছাপাই করেন অসাধারণ সব চিত্রকর্ম। প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছাপচিত্রকর্মটি তাম্রতক্ষণে এচিং মাধ্যমে বিভিন্ন রঙ, রেখা ও ফর্মের সমন্বয়ে রচিত। চিত্রটিতে সমুদ্রের পরিবেশের এক অপরূপ শোভাবর্ধনে কাল্পনিক অনুভূতি ফুটে উঠেছে। ১২২×৮৪ সে:মি: সাইজের চিত্রকর্মটি ২০০৩ সালে নির্মাণ করা।

মনিরুল ইসলাম ১৯৪৩ সালে জামালপুর জেলায় ইসলামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালে ঢাকা আর্ট কলেজ থেকে ডিগ্রী লাভ করেন এবং একই কলেজে শিক্ষকতা করেন। ১৯৬৯ সালে স্পেন সরকারের বৃত্তি নিয়ে স্পেনে গমন করেন। তিনি অদ্যাবধি স্বাধীন শিল্পী হিসাবে মাদ্রিদে শিল্পচর্চায় নিয়োজিত আছেন।

'কবি ও নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে বাণী ও সুরের নানামুখী বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন ড.গুলনাহার বেগম।

৩

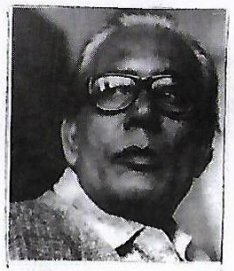

৫

গত ২৯ ডিসেম্বর ছিল বাংলাদেশের চারুকলা আন্দোলনের পথিকৃৎ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ৯৩তম জন্মদিন। এ উপলক্ষে শিল্পীর জীবন এবং কর্ম সম্পর্কে বিশেষ আলোকপাত করেছেন স্বপন ধর।

৯

বরেন্দ্রীয় শিল্প ঐতিহ্য এবং এ অঞ্চলের শিল্পশিক্ষার উত্থান নিয়ে তথ্যবহুল প্রবন্ধ রচনা করেছেন ড. জোসী চৌধুরী।

ড. গুলনাহার বেগম

কবি ও নজরুল সংগীত প্রসঙ্গ

অলংকরণ: তারেক ইকবাল

বাংলা সাহিত্য ও কাব্য চর্চায় অসামান্য প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। অনন্য সাধারণ কবি, কাব্য জগতে তাঁর বিচরণ অতুলনীয় হলেও নজরুল ইসলামের গান, বাণী ও সুরের বৈচিত্র স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। নজরুলের কাব্য রচনা যেমন অসাধারণ সৌন্দর্যে ভূষিত, তাঁর গীত রচনাও তেমনি অপূর্ব বাণীতে ব্যঙ্গময় হয়ে উঠে। বাংলাদেশে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় থেকে নজরুল সংগীত সমাদৃত হয়ে আসছে। বিষয় বৈচিত্রে, আঙ্গিক, রূপরীতি এবং সুরের কারুকাজে নজরুল সংগীত অতুলনীয়। কবি কাব্যে তাঁর আবেগকে প্রকাশ করেছেন নিবিড়তার সঙ্গে, সংগীতে আবার সেই আবেগের অভিব্যক্তিকে রূপ দিয়েছেন এক অনাবিল সৃষ্টির ঝর্ণাধারায়। অর্থাৎ কবির ভাব আর আবেগ মিলে যে বাণী ও সুরের সৃষ্টি হয়েছে, তা মূর্ত হয়েছে তাঁর সংগীতে

নজরুল তাঁর কাব্যের চেয়ে সংগীতের উপর বেশি আস্থাশীল ছিলেন। সংগীত সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। তিনি বলেছেন, 'গান আমার আত্মার উপলব্ধি।' ভাব, ভাষা আর সুর এই তিনের সমন্বয়ে সংগীত। নজরুলের ভাবাবেগপূর্ণ মন প্রতি মূহুর্তে তাঁকে সুর সৃষ্টিতে তাড়া করেছে। ফলে তাঁর সংগীত প্রতিভা এক অনিন্দ্যসুন্দর সার্থক গীতরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ভূবনের মাঝে জড়িয়ে ছিল তাঁর রাগসংগীতের রসাবেগ। আর তাই একাধারে তিনি গজল, কাওয়ালি, নাত, কাব্যগীতি, দেশাত্ববোধক, লোকসংগীত, ইসলামী, হামদ, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, রাগপ্রধান গান, খেয়াল, ঠুমরি, বাংলা গান, হাসির গান, শিশুসংগীত বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি কোন এক শ্রেণীর গানের সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। নজরুল রাগসংগীতের অন্তর্নিহিত ঐশ্বর্যে,

কাজী নজরুল ইসলামের সংগীত ভূবনের মাঝে জড়িয়ে ছিল তাঁর রাগসংগীতের রসাবেগ। আর তাই একাধারে তিনি গজল, কাওয়ালি, নাত, কাব্যগীতি, দেশাত্ববোধক, লোকসংগীত, ইসলামী, হামদ, শ্যামাসংগীত, কীর্তন, রাগপ্রধান গান, খেয়াল, ঠুমরি, বাংলা গান, হাসির গান, শিশুসংগীত বিচিত্র সংগীত সৃষ্টি করে গেছেন। তিনি কোন এক শ্রেণীর গানের সীমায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি।

মহিমায় হয়েছেন মুগ্ধ। আধুনিক গানের প্রতিও তাঁর ছিল প্রবল উৎসাহ। ফলে রাগসংগীতের সাথে আধুনিকতার রস মিশিয়ে তিনি সৃষ্টি করেন নতুন ধারার। অর্থাৎ রাগপ্রধান, কাব্যিক ছন্দে, প্রেমাবেগ ফুটে উঠে তাঁর সৃষ্ট সংগীতে। তদুপরি নজরুল বহু সংগীত গুণীজন ওস্তাদদের সংস্পর্শে যান এবং সংগীতের তালিম নিয়ে নিজের সংগীত প্রতিভাকে সমৃদ্ধ করেছেনে। কবির উল্লেখযোগ্য সংগীতগুরু ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ, কাদের বখশ, দাবীর খাঁ, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ওস্তাদ মাস্তাম গামা প্রমূখ। এছাড়াও তিনি খলিফা বাদল খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সান্নিধ্যে এসে রাগসংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গেঁ বলা যায়, সংগীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুল যতই অগ্রসর হয়েছেন, ততই তিনি রাগসংগীতকে গভীরতরভাবে অবলম্বন করেছিলেন। জীবনের শেষের দিকে রাগসংগীত নিয়ে তিনি নব নব সৃজনশীল প্রয়াসে ব্যাপৃত হয়ে পড়েন।

নজরুলের সমসাময়িক, বাংলা সাহিত্যের যুগশ্রষ্ঠা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশিষ্ট গীতিকার ও সুরকার দ্বিজেন্দ্র লাল, রজনীকান্ত, অতুল প্রসাদ এর নাম উল্লেখপূর্বক নজরুলের সংগীতের আরও বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা যায়। যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সুর অপেক্ষা বাণীর উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কিন্তু নজরুল বাণীর চেয়ে সুরের প্রতি প্রাধান্য দিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুল দুজনেই হিন্দুস্তানি খেয়াল গানের সুরাদর্শের অনুসারী। অতুল প্রসাদের ঠুমরির সুরভঙ্গি এবং রজনীকান্তের নিবেদন ভঙ্গির সঙ্গে নজরুলের ভক্তিভাবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কবির উল্লেখযোগ্য সংগীতগুরু ওস্তাদ জমির উদ্দিন খাঁ, কাদের বখশ, দাবীর খাঁ, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, ওস্তাদ মাস্তাম গামা প্রমূখ। এছাড়াও তিনি খলিফা বাদল খাঁ, ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁর সান্নিধ্যে এসে রাগসংগীতে শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন।

নজরুল তাঁর অভাবিত প্রতিভার গুণে বাংলা গানে রাগসংগীত রচনার ক্ষেত্র নির্মাণ করে সংগীতের ইতিহাস মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর সৃজনশীল পথ ধরে এগিয়ে যাবে স্বাধীন ও মানবিক সমাজ। কাজী নজরুল ইসলাম দেশের অহঙ্কার। যুগশ্রষ্ঠা সংগীত রূপকার।

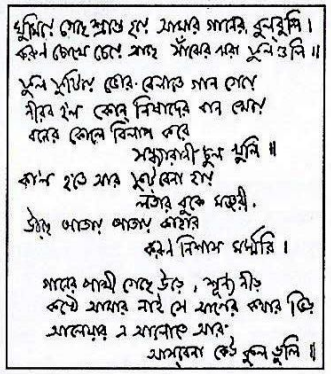
ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে সাগরের গাঙের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের তারা ঘুমে ঢুলি॥
ঘুমি ঘুমিয়ে ভোর বেলাতে যাব গেয়ে
নীরব হল কেন নিষাদের বাঁশ বেয়ে
ধরের কোলে বিলাপ করে
সন্ধ্যারাণী চুল খুলি॥
কান হতে তার খুলে নেবে সোনার দুল
লতার বুকে মঞ্জরী,
ঠোঁটে আজো আছে কাহার
করুণ নিশাস মর্মরি।
গায়ে পাখী গেছে উড়ে, শূন্য নীড়
কহে আমায় নাই সে সাথের কথার ভিড়
আমেদের এ সাবাতে আর
আসবেনা কেউ কুল ভুলি॥

নজরুলের স্বহস্তে লিখিত কাব্য-গীতি

রবীন্দ্র ধ্রুপদ গানকে অবলম্বন করে সুর রচনা করেছেন বলে তাঁর গানে সুর নিয়ে খেলার স্বাধীনতা আছে। এদিকে নজরুলের সুরের মধ্যে গায়কের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার পাশাপাশি উল্লাসের জোয়ার লক্ষনীয়। এ বিষয়ে নারায়ণ চৌধুরী বলেছেন, 'রবীন্দ্র সংগীতে সুরের আবেদন কম। পক্ষান্তরে নজরুল সংগীত সুরে ভরপুর', সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য বাংলা গানের সুর-সম্ভার বৈচিত্রে গজল গানের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন রাগ রাগিনীকে প্রকাশ করতে নজরুল সমর্থ হয়েছিলেন । তাঁর উল্লেখযোগ্য সংগীতের কয়েকটি, 'কেউ ভোলে না কেউ ভোলে', 'এত জল ও কাজল চোখে পাষানী', 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে...', 'আমার কোন কূলে আজ ভিড়লো তরী'। নজরুল তাঁর অভাবিত প্রতিভার গুণে বাংলা গানে রাগসংগীত রচনার ক্ষেত্র নির্মাণ করে সংগীতের ইতিহাস মহিমান্বিত করেছেন। তাঁর সৃজনশীল পথ ধরে এগিয়ে যাবে স্বাধীন ও মানবিক সমাজ। কাজী নজরুল ইসলাম দেশের অহঙ্কার। যুগশ্রষ্ঠা সংগীত রূপকার।

স্বপন ধর

ব্রহ্মপুত্রের বরপুত্র শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন

১৯১৪ সাল। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম। মা জয়নাবুন্নেছা। বাবা তমিজ উদ্দিন আহমেদ। ১৯৩০ সালে বাড়ি থেকে পালিয়ে দেখে আসেন কোলকাতার বিখ্যাত চারুকলা স্কুল। বক্ষে তাঁর বাসনা অপার। চারু বিদ্যা শিক্ষায় নাছোড় বান্দা। মায়ের গলার হার বিক্রি করালেন। এগুলেন গন্তব্যের দিকে। বাসনার দেবী ধরা দিল। কালি, জল, তেল সব রঙ মেলে ধরলেন ক্যানভাসে।

নদী। আশ্চর্য নদী মেখলা এক দেশ। শরীরের শিরা-উপশিরার মত কত অসংখ্য নদী জালের মত জড়িয়ে, ছড়িয়ে আছে। ব্রহ্মপুত্র বয়ে গেছে তার হৃৎস্পন্দন বেয়ে। বৃহত্তর ময়মনসিংহকে দু-ভাগ করে নব্যভূমিকে করেছে উর্বরা। পরশুরামের কুঠারকে লাঙল করে লাঙলবন্ধ গিয়েছে যে জলধারা তার পৌরাণিক নাম লৌহিত্য। অনন্ত কিংবদন্তি নিয়ে হিমালয়ের গিরিগর্ভ থেকে বেরিয়ে এসেছে ভাটির দেশে। তার আকাশে বাতাসে ভাটিয়ালি সুর। বিশ্বশ্রুত ময়মনসিংহ গীতিকার আকর ভূমির প্রাথমিক পর্বে আদিম সাম্যবাদী সমাজ এবং ঈশা খাঁর পরগণা থেকে বাংলাদেশ; অসংখ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ বিদ্রোহ-সংগ্রামের সফলাভূমি। ওয়ারী-বাটেশ্বরের প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ ব্রহ্মপুত্র বহু মনীষীর তীর্থস্থান। তার জলের বুকে হাওয়ায় দোলে পালতোলা নাও। দুধারে কাশবন সাদা। উপরে আকাশ। বিচিত্র মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়ায় যক্ষদূত। নদীর জলতরঙ্গের সঙ্গে চলে তার মিতালি, লুকোচুরি খেলা। কৌতূহলী কিশোর ভাবে এ নদী কোথায় যায়? নাবিক হলে বুঝি দেখা যেত চলন্ত ঢেউয়ের অবিরাম খেলা। মনে লাগে দোলা। সে ভালবেসে ফেলে নদীকে। নদীই তাকে ঘর ছাড়া করে। এ নদী একদিন ইংরেজ সিভিলিয়ান রবার দিউকে প্রেমে মজিয়ে ছিল। (রবার দিউ: পুরোনাম 'আইজাক টওনলি রবার দিউ' প্রথমে কোম্পানির রাইটার। ১৮০১ সালের ২৩ জুন ময়মনসিংহের সহকারী কালেক্টর এবং ১৮০৫ সালে জেলার ভারপ্রাপ্ত জজ ছিলেন।) দিউ এঁকেছিলেন ময়মনসিংহের প্রকৃতির ছবি। ব্রহ্মপুত্রের এবং ব্রহ্মপুত্র পাড়ের সে-সব ছবি আজো তার স্মৃতি বহন করে চলেছে। ময়মনসিংহের সার্কিট হাউজের কক্ষে

(সার্কিট হাউজে রক্ষিত এ ছবি ময়মনসিংহবাসীর মহামূল্যবান সম্পদ) দুইশ বছর আগের সেই ছবি কি ভাবীকালের শিল্পীগুরুকে প্রেরণা দিয়েছিল? রবার দিউ এর পাণ্ডুলিপির স্কেচ (১৮০১-১৮০৮) শিল্পাচার্যকে প্রেরণা দিক আর না দিক ব্রহ্মপুত্র যে তাঁর প্রধান শিক্ষক সে কথা তিনি ভুলে যান নি। ১৯১৪ সাল। ব্রহ্মপুত্র বিধৌত ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে তাঁর জন্ম। মা জয়নাবুন্নেছা। বাবা তমিজ উদ্দিন আহমেদ। ১৯৩০ সালে বাড়ি থেকে পালিয়ে দেখে আসেন কোলকাতার বিখ্যাত চারুকলা স্কুল। বক্ষে তাঁর বাসনা অপার। চারু বিদ্যা শিক্ষায় নাছোড় বান্দা। মায়ের গলার হার বিক্রি করালেন। এগুলেন গন্তব্যের দিকে। বাসনার দেবী ধরা দিল। কালি, জল, তেল সব রঙ মেলে ধরলেন ক্যানভাসে। সূচনায় রোমান্টিক ল্যান্ডস্কেপ। তারপর, বাঙালি জীবনে এলো বিভীষিকা। সোনার দেশে মড়ক। চারিদিকে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের হাহাকার। ডাস্টবিনের পতিত খাবারও উধাও। উজাড় হয়ে যাচ্ছে জনপদ। বাংলা ১৩৫০, ইংরেজি ১৯৪৩। পঞ্চাশের মন্বন্তর। শিল্পীর হৃদয় কেঁদে উঠলো। তিনি মমতা দিয়ে আঁকলেন মানুষের আকুতি। বৃথা গেল না সে-সব। দুগ্ধবিহীন মাতৃস্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম 'ম্যাডোনা-৪৩' আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিল শিল্পীকে। তারপর পাঠরতা মেয়ে (১৯৪৮) সাঁওতাল দম্পতি রমণী ও মই দেয়া, বিদ্রোহী (১৯৫১), বধূ, দুই মহিলা, চিন্তারত পাইন্যার মা, গ্রাম্য মহিলা, মুখচতুষ্টয় (১৯৫৩), সংগ্রাম (১৯৫৯), বাংলাদেশের জীবন প্রবাহ, ফিলিস্তিনি যুদ্ধ শরণার্থী (১৯৭০), বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুখ (১৯৭১), এসবের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। 'সংগ্রাম' চিত্রে ধরা পড়েছে অন্তহীন জীবন যুদ্ধ। একক মানুষের এ সংগ্রাম মানসিক শক্তির সংগ্রাম। এবং এ সংগ্রাম অনিবার্য। কিন্তু হার মেনে বশীভূত হবার লড়াই এ নয়। বেঁচে থাকার এ সংগ্রাম কোথায় নেই? ফেরির জন্য অপেক্ষা, দুর্ভিক্ষ চিত্র সিরিজ, বিদ্রোহী, কালবৈশাখী, গুণটানা, বাংলাদেশের জীবন প্রবাহ, বীরমুক্তিযোদ্ধা এ সবতো সংগ্রামেরই নামান্তর।

বাংলা ১৩৫০, ইংরেজি ১৯৪৩। পঞ্চাশের মন্বন্তর। শিল্পী হৃদয় কেঁদে উঠলো। তিনি মমতা দিয়ে আঁকলেন মানুষের আকুতি। বৃথা গেল না সে-সব। দুগ্ধবিহীন মাতৃস্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম 'ম্যাডোনা-৪৩' আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দিল শিল্পীকে।

আত্মদর্শন, আত্মবিচার, মানবিক যন্ত্রণা, অসহায়ত্ব তাঁর ছবিতে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত। এ ছবি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। 'পাইন্যার মা'র (১৯৬৩) মত কিংকর্তব্যবিমূঢ় রমণীর ছবি হয়তো আমরা পাচ্ছি তাঁর উত্তরসূরীদের কাছ থেকে। কিন্তু 'আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সন্তানদের ছবি' কিংবা তেলরঙে নিখুঁত আঁকা 'ব্লানরতা যুবতী দেহ'। কিংবা 'কবিগুরুর ধীরললিত মুখমণ্ডল'-শিল্পীগুরু ছাড়া কে আঁকবে অমন দরদ দিয়ে? (বিশেষ করে, বর্তমান ছবি যখন টেকনিক প্রধান পরাবাস্তবতার দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে...।) কালি, তুলি, জল-তেল তাঁর প্রধান মাধ্যম। অজন্তা-ইলোরা বা আলতামিরা গুহাচিত্র প্রাচীন মানুষের মননশৈলীর গুরু-ঐশ্বর্য প্রকাশ করছে তেমনি জয়নুলের তুলির কবিতা আজ আমাদের বাঙালি গৌরবের আঢ্যকে বারবার স্মৃতিমুখী করে তুলেছে। ইন্দ্রীয়কে অতিন্দ্রীয় এবং অতিন্দ্রীয়কে ইন্দ্রীয় করে তোলার ক্ষমতা তিনি অর্জন করেছিলেন প্রকৃতির কাছ থেকে। দৃশ্যগত চেতনার সাথে অদৃশ্যগত চেতনার মিলনের ধূম্রজাল তৈরী করতে তিনি যাননি। তবে সৃজনশীল ও মননশীল মেধার যুগল রায়ে নির্বাচিত হত তাঁর শিল্প-চিত্র-কবিতা। আবেগ আর মননের যুগলে তাঁর চিত্র পেয়েছিল মনি-কাঞ্চনের সাক্ষাৎ। শিল্পের বাহিরেও যে এক বড় জীবন থাকে সে জীবন থেকেও তিনি বিচ্ছন্ন হননি। তাই দেখা যায় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আর্ট স্কুলে তাঁর অবদান অসামান্য। তিনি সেই দিন শত সংগ্রাম করে একটি চারু-কারুর আকাশ তৈরী করে দিয়েছিলেন। সেই আকাশে আজ অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। তবে এর মাঝে কেউবা কৃষ্ণগহ্বর, কেউ উজ্জ্বল আদিত্য-অর্ক হয়ে স্বভূমে প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৮-১৯৪৬ পর্যন্ত শিল্পী কোলকাতায় অবস্থান করেন এবং সেখানে চাকুরিও করেন। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের সরকারের বিভিন্ন উচ্চপদে যোগ দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এ দেশ তাঁর স্বপ্নের দেশ নয়। করাচি থেকে তিনি ফিরে এলেন ঢাকায়। এবং ঢাকা গভর্ণমেন্ট ইন্সটিটিউট অব আর্টসকে মহাবিদ্যালয়ে

রূপান্তর করলেন। আজ সেটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম বিভাগ। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর অবদান অসামান্য। পাঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু যেমন 'নাইট' উপাধি পরিত্যাগ করেছিলেন। শিল্পীগুরু তেমনি পরিত্যাগ করেছিলেন পাকিস্তান সরকারের দেয়া সর্বোচ্চ খেতাব 'হিলালে ইমতিয়াজ'। সমরাঙ্গণে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের বীরত্বব্যঞ্জক ছবি এঁকে তাঁদের অনুপ্রাণিত করেন।

২০০৭-এর মর্মান্তিক সিডরের মত ১৯৭০ সালের ভয়াবহ ঝড় জলোচ্ছ্বাসের ছবি এঁকে ক্ষতিগ্রস্থদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কলেছিলেন।

জয়নুলের মত উনবিংশ ও বিংশ শতকের শিল্পীরা ময়মনসিংহকে উর্বরা করতে পেরে ছিলেন-তা এ অঞ্চলের বিচিত্র ভূমন্ডলের জন্যই। বাঙালি জীবনের করুণতম বছর (১৯৪৩) কে জীবন্ত করে রেখেছেন তিনি। সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক অনাহারে মারা যায়।

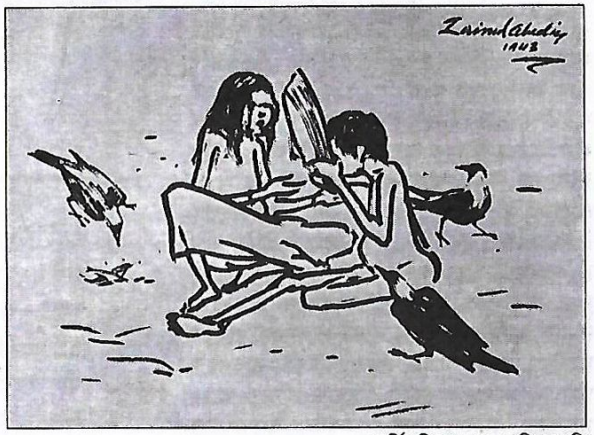

দুর্ভিক্ষচিত্র ১৯৪৩, কালি ও তুলি

স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি বাংলা একাডেমীর সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধুর আহবানে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানের অঙ্গসজ্জা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠকীর্তি। শিল্পকলার উন্নয়নে তাঁর চিত্রকর্ম সংগ্রাম (১৯৫৯) এর মতোই তিনি আমৃত্যু লড়াকু ছিলেন। আমাদের ভালবাসায় সিক্ত যথার্থ শিল্পাচার্য তিনি। দল-মত নির্বিশেষে এমন গণ-মানুষের তর্কাতীত আন্তজার্তিক পুরষ্কারে পুরস্কৃত এ মহান শিল্পী বাংলাদেশের জাতীয় অধ্যাপক হবার গৌরব লাভ করেছিলেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে দিয়েছিল সাম্মানিক ডক্টরেট। ক্যানভাসের মত বিশাল হৃদয়ের এ শিল্পী-অনেকটাই অজাতশত্রু ছিলেন।

'নদীই আমার শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।' কিংবা 'ছবি আঁকার পূর্ব শর্তই হলো প্রাণ নিঙরানো আবেগের প্রতিফলন।' এমন সুভাষিত সত্য ভাষণ তাঁর হৃদয়কে উদার করে গড়ে তুলেছে। রবার দিউ, উপেন্দ্র কিশোর, শশী কুমার হেশ, হেমেন্দ্র মজুমদার, অতুল বসু, ফণিভূষণ গুপ্ত, অখিল নিয়োগী, কুমার রবীন রায়, সোমেন রায়, আশুতোষ, বিজন বাবু (মুক্তাগাছার রাজবাড়ির সজ্জাশিল্পী) এবং জয়নুলের মতো উনবিংশ ও বিংশ শতকের শিল্পীরা ময়মনসিংহকে উর্বরা করতে পেরে ছিলেন-তা এ অঞ্চলের বিচিত্র ভূমন্ডলের জন্যই। বাঙালি জীবনের করুণতম বছর (১৯৪৩) কে জীবন্ত করে রেখেছেন তিনি। সেই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ হাজার লোক অনাহারে মারা যায়। বাংলাদেশের কপালে দারিদ্র তিলক পরিয়ে দেয় ১৯৪৩। উপমহাদেশের সবচেয়ে ধনী প্রদেশ এবং সাংস্কৃতিক তীর্থভূমি বাংলা শীর্ষ অবস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। ১৯৫৭ সালের পরাধীনতার শিকল পরানোর পর ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক বীজ বপন তারপর ১৯২২ সালে দেশীয় শিল্পীধ্বংস, ১৫৫ বছরের পুরোনো রাজধানী কোলকাতা থেকে দিল্লী স্থানান্তর, ১৯৪৩ সালের দিকে ব্রিটিশ-ভারতের বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়া, ব্রিটিশ সৈন্যদের ভরপেট খাবার দিতে গিয়ে বাঙালি চিরকালের জন্য নুয়ে পড়ে। জাপান-বার্মা দখল করে ঘরের কোণে এসে দিচ্ছে হানা; দেশীয় নৌকা দিয়েছে ডুবিয়ে। এভাবে দারিদ্রের যে সুচনা হয় তা মহামারি রূপ ধারণ করে বাংলাদেশকে চিরপঙ্গুত্ব বরণে বাধ্য করেছে। জয়নুল ইতিহাসের এমন এক নির্মম অধ্যায়কেই চিহ্নিত করেছিলেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের ছবিতে।

এ মহান শিল্পী সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক লেখক জেমস জে নোভাক বলেছিলেন, 'এমন এক পৃথিবীর জীবন্ত প্রতিকৃতি এঁকেছেন জয়নুল যেখানে কাকগুলো হৃষ্টপুষ্ট তেলতেলে, শকুনগুলো সুস্থবল, খরা এবং যুদ্ধে মরতে বসেছিল বাংলা। প্রচন্ড ক্ষুধা তাড়া করছিল বাংলাদেশকে। উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটছিল হতাশ, বিবস্ত্র অনাহারী মানুষ। তাদের অনুসরণ করেছিল বিভিন্ন শবলোভী পাখির দল...'

'...জয়নুল আবেদিনের পেইন্টিংগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে কেন ১৯৪৩-এর দৃশ্য শুধু যাদুঘরের প্রদর্শনীতে নয় বরং সারা বাংলাদেশে প্রদর্শিত হয়। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে সারাক্ষণ দিগন্তে ওৎপেতে থাকে। এবং ১৯৪৩-এর প্রেতাত্মা ঘুর ঘুর করে।' '...১৯৪৩ সালে হারিয়ে যায় সেই গৌরব উজ্জ্বল অতীত তারই আলামত মূর্ত হয়ে উঠেছে জয়নুল আবেদিনের শিল্পকর্মে। নিষ্ঠুর আকাশের নিচে কালচে ধুলি-ধুসর খাকি রং বিরান প্রান্তরের গলি-ঘুঁজি দিয়ে এগিয়ে চলা পরিবারগুলোর দিকে তাকিয়ে একই দলকে ইউরোপের বিভিন্ন বন্দি শিবির থেকে ছাড়া পাওয়া কংকালসার মানুষগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে রাস্তায় বসে পড়েছে অনেকেই। তাঁদের পাশেই অপেক্ষা করছে মরা খেকো! হৃষ্টপুষ্ট কাকগুলো অপেক্ষা করছে অনাহারী শিশুদের মৃত্যু। রঙের মনোহর ব্যবহার সত্ত্বেও জয়নুল আবেদিনের পেইন্টিংগুলো বিষণ্ন ভাবাদর্শ বর্জিত। যার মধ্যে বাংলার ঐতিহ্যের ছিটেফোটাও নেই। এই মাধ্যমটা কোনো বার্তা সম্পর্কে হুশিয়ারি উচ্চারণ করে না, কিন্তু মানুষের নিরলঙ্কার দৈন্যের জীবন্ত বর্ণনা তুলে ধরে। জয়নুল আবেদিনের এসব পেইন্টিং পর্যালোচনার পর কল্পনা করা কঠিন হয়ে ওঠে যে, ১৯৪৩ সালের আগের দুই হাজার তিনশ বছরের লিখিত ইতিহাসে আজকের বাংলাদেশ কখনো গরিব ছিল না। ১৯৪৩ সাল থেকেই বাংলাদেশ দীর্ঘদির জন্য ভিক্ষুকে পরিণত হতে থাকে।' উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও পাঠক মাত্রই বুঝবেন এ-বক্তব্যের সারসত্তা কতটুকু।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেন রাজাদের অত্যাচারে যে সকল বাঙালি শিল্পী দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পাহাড়পুর, ময়নামতি এবং ব্রহ্মপুত্র পাড়ের মধুপুরের গুপ্ত বনাবনে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরও অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে চারুশিল্পের যে প্রচলন ছিলো

'...জয়নুল আবেদিনের পেইন্টিংগুলো নিয়ে একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে যে কেউ বুঝতে পারবে কেন ১৯৪৩-এর দৃশ্য শুধু যাদুঘরের প্রদর্শনীতে নয় বরং সারা বাংলাদেশে প্রদর্শিত হয়। খরা, বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে সারাক্ষণ দিগন্তে ওৎপেতে থাকে। এবং প্রেতাত্মা ঘুর ঘুর করে।'

তার সন্ধান আমরা পাই চীনা পরিব্রাজক চুয়াং-এরভ্রমন বৃত্তান্তে। ব্রহ্মপুত্র পাড়ের বসবাসকারী লোকদের কাদা দিয়ে লেপা দেয়াল, উঠানে সাদা রঙ দিয়ে নানা ফুল, লতা-পাতা আঁকা প্রকৃতির যে নিখুঁত বর্ণনা তা অতীতের পাল শাসন তথা বৌদ্ধ শাসনেরই ইঙ্গিত দেয়। হাজার বছর ধরে বাঙালি এই যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলছে-তা মূলত ব্রহ্মপুত্রের মতে অসংখ্য নদী বিধৌত পলন অঞ্চলকে ঘিরেই। জয়নুল আবেদিন এ অঞ্চলেরই যোগ্যতম সন্তান। সত্যি করে বললে তিনিই ব্রহ্মপুত্রের বরপুত্র। আমাদের আকাঙ্খার ধন।

প্রবন্ধ

বরেন্দ্রীর অনেক শৈল্পিক নির্দশন সমসাময়িক কালে অবশিষ্ট নেই। এই অঞ্চলের শিল্পীসত্তা চৈতন্য বিকাশের পর্বগুলো বিলুপ্ত প্রায়।

ড. জোসী চৌধুরী

এক উত্তরাধিকারের উজান যাত্রা

আধুনিক বরেন্দ্রভূমি পশ্চিমে মহানন্দা আর পূর্বে করতোয়া নদীর মধ্যস্থিত বিশাল ভূভাগ নিয়ে গঠিত। প্রাচীনকালে এই ভূখন্ডের নাম ছিলো বরেন্দ্রী। ইন্দ্রের 'বর' প্রাপ্ত অঞ্চল। বরেন্দ্রীর বিকৃত রূপ 'বরিন্দ' অঞ্চল বিশেষে বর্তমান কালেও ব্যবহৃত। এই ভূখন্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সুদূর অতীতের বহু অনুসঙ্গের পবিত্র স্মৃতি। ভূতত্ত্বের দিক থেকে এই অঞ্চলের বহু অংশ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ভূখন্ডের অন্তর্ভূক্ত। ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিলো বঙ্গদেশে আর্যদের প্রাচীনতম উপনিবেশ, মুসলমান বিজেতারাও বঙ্গদেশের এই অঞ্চলই দেখেছিলো সর্বোত্তম ভূখন্ড হিসেবে। অতএব এই অঞ্চল স্মরণাতীতকাল থেকেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি। 'রামচরিতম' গ্রন্থের গ্রন্থিক সন্ধাকর নন্দী খ্রিষ্টীয় এগারো শতকের শেষের দিকে যিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন-এই অঞ্চলকে পবিত্রতম বলে আখ্যায়িত করেছেন। দেড় হাজারেরও বেশি সময় ধরে গৌড়ের সুলতানদের আমল পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব আর সাংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ছিলো এই বরেন্দ্র অঞ্চল। বরেন্দ্রী ছিলো পুন্ড্রদের নামে পুন্ড্রবর্ধনভুক্তি বলে পরিচিত ভূখন্ডের চতুঃসীমার অর্ন্তভূক্ত এবং সর্বভারতীয় সুবিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত। পুন্ড্রনগর ছিলো এর রাজধানী। বর্তমানে পুন্ড্রনগর এলাকা মহাস্থানগড় বলে চিহ্নিত। সৌন্দর্য চেতনা মানবস্বভাবজাত। আলতামিরা গুহার দেয়ালচিত্রের বাইসনের বঙ্কিম ভঙ্গির মধ্য দিয়ে যে অপরূপ বাস্তব সৌন্দর্য প্রকাশিত তা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষের সৌন্দর্যবোধের এক আদিতম উদাহরণ। তবে সৌন্দর্য বিষয়টি মর্যাদা পায় মানুষের বিচারবুদ্ধির ওপর। মূল্যায়ন ছাড়া সৌন্দর্য পরিমাপ কঠিন। প্লেটোর Pleasurable experience অর্থাৎ আনন্দময় অভিজ্ঞতা কিম্বা সান্তায়ানা'র objectified pleasure অর্থাৎ বস্তুগত আনন্দ অথবা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আনন্দ যখন রূপ ধরে'-এর মতো সংজ্ঞাগুলো পরিক্রম করলে এ সত্যই বেরিয়ে আসে সৌন্দর্যানুভূতি মানুষের একটি স্বতন্ত্র বৃত্তি। আনন্দ বস্তুরূপ ধারণ করলে অর্থাৎ রূপের আধারে আনন্দবৃত্তি নিজেকে ব্যক্ত করলে তবেই সৌন্দর্যমূল্য সৃষ্টি হয়।

বরেন্দ্রীর অনেক শৈল্পিক নির্দশন সমসাময়িক কালে অবশিষ্ট নেই। এই অঞ্চলের শিল্পীসত্তার চৈতন্য বিকাশের পর্বগুলো বিলুপ্ত প্রায়। এই বিলুপ্ত প্রায় নিদর্শনের অন্যতম 'কান্তজীর মন্দির' স্থাপত্যকর্ম হিসাবে এটি যত মূল্যবান তার চেয়ে অনেক বেশি এর শিল্পশৈলীর জন্য। বস্তুত কান্তজীর মন্দির নিজেই এক মহান শিল্পকর্ম, পোড়ামাটির অলঙ্করণে এক মহাকাব্য।

বরেন্দ্রীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুবিস্তৃত পালযুগীয় ধ্বংসাবশেষ পাহাড়পুরের 'সোমপুর বিহার'। খ্রিষ্টীয় অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর কালান্তবর্তী উপমহাদেশের সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচয় বহন করছে এই ধ্বংসাবশেষ। বরেন্দ্রীর এইসব স্থাপত্যগাত্রে উৎকলিত রয়েছে পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক। পলি আবৃত সমভূমি প্রধান এই গাঙ্গেয় উপত্যকায় পাথর দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় শিল্প তৈরীর কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে মাটি। যদিও বিপুল পরিমাণ ভাস্কর্য তৈরী হয়েছে পাথর দিয়ে। ভাস্কর্যের জন্য পাথর আমদানি করা হয়েছে বাংলার বাইরে থেকে। গ্রামে বসে শিল্পীরা ধাতবশিল্প, চিত্রশিল্প চর্চার পাশাপাশি ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে গড়ে ওঠা এই ভাস্কর্য শিল্পের বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় ধর্মপ্রচারোদ্দেশে উত্তরাখন্ডে আসা তিব্বতীয় ঐতিহাসিক লামা তারানাথের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার' শীর্ষক গ্রন্থে। লামা তারানাথ বরেন্দ্রের দুই যশস্বী শিল্পী ধীমান পাল ও তার পুত্র বীত পালের উল্লেখ করে লিখেছেন, এই পিতা-পুত্র তক্ষণশিল্প, ধাতবশিল্প এবং চিত্রশিল্পে বিশিষ্ট শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ ছাড়া 'দেওপাড়া প্রশস্তি'তে জনৈক মনদাস-পৌত্র ও বৃহস্পতি পুত্র বরেন্দ্রক চূড়ামণি রাণক গুলপাণির কথা উল্লেখ রয়েছে। বরেন্দ্রভূমিতে নির্মিত বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য দেব দেবীর সেই বিপুল সংখ্যক ধর্মাশ্রিত ভাস্কর্য বঙ্গীয় শিল্পকলার ইতিহাসে এক নতুন জীবনায়ন নিয়ে বর্তমান। যদিও বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্পচর্চার প্রাচীনতম উদাহরণ বৌদ্ধ গ্রন্থ 'দিব্যাবদান' এর একটি কাহিনী 'বীতাশোকাবদান'। বীতাশোকাবদান-এ উল্লেখ রয়েছে পুন্ড্রবর্ধননগরের নির্গ্রন্থী উপাসকেরা 'বুদ্ধদেব নির্গ্রন্থীর পদতলে পড়ে আছেন' এমন দৃশ্য চিত্রার্পিত করেছিল। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট অশোক পুন্ড্রবর্ধননগরের নির্গ্রন্থী আজীবকদের সমূলে বিনাশ করেছিলেন। কাহিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা না করলেও প্রকাশিত সত্য এই যে খ্রিষ্টপূর্বকালে বরেন্দ্রর সমৃদ্ধ নগরী পুন্ড্রবর্ধনে চিত্রশিল্পের প্রচলন ছিল।

বরেন্দ্র অঞ্চলের পুরাকীর্তি সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যেই ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কৃতবিদ্য তিন বাঙালি কুমার শরৎকুমার রায়, অয়কুমার মৈত্রেয় এবং রমাপ্রসাদ চন্দের উদ্যোগে রাজশাহীতে 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' গঠিত হয়। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে সমিতি রেজিস্ট্রিকৃত হলে উপরোক্ত তিনজনের সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামকমল সিংহ ও কোলকাতা জাদুঘরের রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে অনুসন্ধানী দল বরেন্দ্রের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে দুষ্প্রাপ্য পুরাকীর্তির নিদর্শন সংগ্রহ করে রাজশাহী শহরে নিয়ে আসেন। এই সংগ্রহসমূহ সংরক্ষণ ও প্রদর্শনের সমস্যা থেকে উত্তরণের উদ্দেশ্যে একটি জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় আন্তরিক প্রচেষ্টায় ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ নভেম্বর বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল জাদুঘরের শিলান্যাশ করেন এবং

'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার ৬৮ বৎসর পর ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বিস্তীর্ণ চত্ত্বরে প্রাগৈতিহাসিক রূপকারের প্রস্তর মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান উদ্বোধন করলেন এই বিদ্যায়তনটির।

১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ নভেম্বর লর্ড রোলান্ডশ জাদুঘরের দ্বারোদঘাটন করেন। আনন্দ আপ্লুত কণ্ঠে অক্ষয়কুমার ঘোষনা করলেন-

"I may now reasonable hope that our educated young man, bent down with the load of heavy test books of the University and sent out of the World with indifference or a scoffing sprint in respect of further study will take interest in the study of the antiquities of the land of our birth."

অয়কুমার মৈত্রেয় রচিত 'The Ancient Monument of Veranda' মনোগ্রাফ-৭ এর ভূমিকায় ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখলেন- "Maitra was not content with mere scholarly pursuits at his desk. He rightly felt that to know the history of Bengal it was not enough to study the few available data, but it is absolutely necessary to collect more material by local investigations. Even the stray finds of images had convinced him of the rich artistic treasures of Bengal, and he rightly felt that the real history of our motherland lay buried in her soils in the shape of old monuments and images. Hence began that ardent searcher monuments to which he devoted the rest of his life, the result of his search show his unrivalled knowledge of the monument lying scattered over a vast area and a genuine appreciation of their historical importance."

অক্ষয়কুমার একটা বিষয় সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রচীন বাংলার ইতিহাস পুনরুদ্ধার করতে হলে শুধু পড়ার টেবিলে বসে সম্ভব নয়, এজন্য প্রয়োজন পুরাকীর্তির পুনরুদ্ধার এবং তার সঠিক ও নিরপেক্ষ পাঠ। উপলব্ধ চেতনার প্রকৃত বাস্তবায়নকল্পেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি'-'বরেন্দ্র রিচার্স মিউজিয়াম'। গৌড়ের প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীর অনুসরণে নির্মিত এই জাদুঘর অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গীয় শিল্পকলার সমৃদ্ধভান্ডার হিসাবে সারাবিশ্বে পরিচিত লাভ করে।

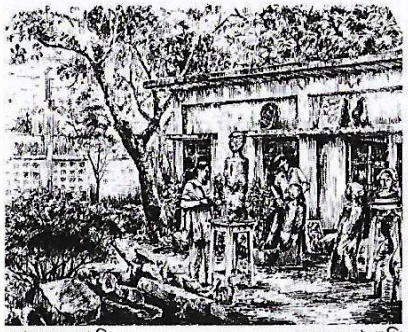

চারুচত্ত্বর, রা.বি. অলংকরণ: হলি

'বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি' প্রতিষ্ঠার ৬৮ বৎসর পর ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ ডিসেম্বর শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের জন্মবার্ষিকীতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রাজশাহী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়'। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বিস্তীর্ণ চত্ত্বরে প্রাগৈতিহাসিক রূপকারের প্রস্তর মুর্তির মতো দাঁড়িয়ে শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান উদ্বোধন করলেন এই বিদ্যায়তনটির। শিল্পী বনিজুল হকের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠান নির্মাণে ব্রতী কৃতবিদ্য একদল তরুণ সেই মহান তিন বাঙালির উত্তরসূরী হয়ে এগিয়ে এসেছিলো। যার সাথে যুক্ত হয়েছিলো

অনেক প্রতিকুলতা অতিক্রম করে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বিদ্যায়তনটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শুরু হয় বরেন্দ্রভূমির চারুশিল্পের এক উত্তরাধিকারের উজান যাত্রা।

অভিজ্ঞবয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সাংবাদিক কামাল লোহানী, কালাম মাহমুদ, ড. মোখলেসুর রহমান (কিউরেটর, বরেন্দ্র রিসার্স মিউজিয়াম), মনসুর আহমেদ খাঁন, শিল্পী রফিকুন্নবী, শিল্পী আবুল বারক আলভী, শিল্পী কাইয়ুম, বদিউজ্জামান টুনু বীরউত্তম, এলতাস উদ্দিন আহমেদ ও গিয়াস উদ্দিন আহমেদ (অধ্যক্ষ টি.টি.কলেজ) এবং প্রফেসর ড. এম.এ. রকিব (উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) প্রমূখের উদ্যোগী কর্মপ্রয়াস। ৩০ শে ডিসেম্বর ১৯৭৮ থেকে টি.টি. কলেজের একাডেমিক ভবনের একাংশে চারুকলা পাঠের সূচনা হয়। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বর্তমান চারুকলা ভবনের স্থান নির্ধারণ করে চারুকলা ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করে। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়কে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গিভূত মহাবিদ্যালয় হিসাবে ঘোষণা করা হয়। তারপর অনেক প্রতিকুলতা অতিক্রম করে ১৯৯৪ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর বিদ্যায়তনটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শুরু হয় বরেন্দ্রভূমির চারুশিল্পের এক উত্তরাধিকারের উজান যাত্রা।

ছোটগল্প

রুবেল রাজা

যার যে ক্ষমতা

অলংকরণ: মাহবুব রশিদ

এক.

লেবু মুন্সি ভাবে নয় আনা, কাজে ছয় আনা। কথার সঙ্গে কাজের মিল নেই বললেই চলে । বেশভুষায় পাকা মুন্সি হলেও স্ত্রী জোবেদার সঙ্গে ঝগড়া করার সময় তাকে যে সব ভাষায় গালিগালাজ করে তা বর্ণনা করা কঠিন । পোড়ামুখী, গতরখাকি, এমন কি মাগী বলে গালি দিতেও দ্বিধা করত না। আবার জোবেদাকে সে খুব ভালোও বাসে–আদর করে মওলানা সাহেবের মুখে শোনা অর্ধ বিস্মৃত ফতোয়া শোনায়; স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য বুঝিয়ে দেয়। কিন্তু তার ক্ষমতা ও দাপট নিয়ে কেউ তুচ্ছতা করলে মুন্সির মাথা গরম হয়ে যায়-বিশেষ করে জোবেদা কিছু বললেই হয়। চরম উত্তেজনায় বলে "মাইয়া মানুষের মুখে বড় বড় কথা শুনলে গা জ্বলে-যত বড় মুখ না তত বড় কথা"।

একদিন রাতে হাসাহাসিকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীতে শুরু হয় বাক্‌যুদ্ধ। লেবু মুন্সি বলে -"জানো, মাইয়া মানুষের দাঁত বের করে হাসা শরিয়তে নিষেধ"।

-মাইয়া-ব্যাটা কথা নয়, যেই হাসুক দাঁত বের হবেই। দাঁত বের না করে কেউ হাসতে পারে? এটা কেমন বিধান?

-চুপ্ হারামজাদী, কাইল জুম্মায় মওলানা সায়েব কেতাব দেখেই এই মছল্লা দিছে, আর তোমার কাছে তা ভালো ঠেক্‌ছে না!

–মওলানা সায়েব কইছে, আর তার লজ্জন নাই বুঝি!

–কাফেরের মাইয়া কয় কি! তোমার বাপের জনমে কেউ অত বড় মওলানা হইছে না-কি, য়্যা!

–আমার বাপ কুলে না হয় কেউ হয় নাই, কিন্তু নিজে কেন সারা জীবন মোয়াজ্জেন থাকলে শুনি?

–আর বেশি কথা বল্লে ভালো হবেনা কিন্তু। ঈমান- মোয়াজ্জেন ধরতে গেলে সমান-সামান্য আগে আর পিছে। কিন্তু তোমার বাপের মত ফকির নয়।

স্বামীর তেল কুচকুচে কোঁকড়ানো চুল গুলোর খানিক নিচ দিয়ে-রক্ত চক্ষু দেখে জোবেদা থেমে যায়। মুন্সি আপন মনে আরও কিছুক্ষণ গালিগালাজ করার পর যখন জোবেদার কোন সাড়া কিংবা প্রতিক্রিয়া পায়না, তখন থেমে যায়।

দুই.

ছয় মাস পর। একদিন লেবু মুন্সির ঘরে চাল নেই। মুন্সি পাড়ার দু'একজনের বাড়ি সহ ঈমাম সাহেবের বাড়ি ঘুরেও একটু চালের ব্যবস্থা করতে পারলো না। ছোট ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়ে ফেললো। জোবেদা অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীর ভর্ৎসনায় মশগুল-তোমার এত সুনাম, এত খ্যাতি, সবাই তোমাকে হুজুর হুজুর করে; এতই যদি ক্ষমতা তোমার তা এই কচি ছেলেটার মুখে একটু ভাত এনে দিতে পারছ না কেন? লেবু মুন্সি কিছু বলে না। জোবেদা আবারও বলে-"তোমার চেয়ে রেললাইনের ধারে যে ফকির থাকে তারই ক্ষমতা বেশি, ভিক্ষা করলেও তারা কিছু আনতে পারে, কিন্তু তুমি তাও তো পারলে না। আর খালি খালি ক্ষমতা ক্ষমতা করে.....!"

জোবেদার এই ভর্ৎসনা শূল হয়ে মুন্সির বুকে বিঁধে। রাগে ক্ষোভে অপমানে জ্ঞানশূণ্য হয়ে "ক্ষমতা দেখতে চাও, আসো" বলে জোবেদার হাত ধরে বাড়ির কানাচে টেনে নিয়ে যায়। স্ত্রীকে কি করবে বুঝতে পারে না। হঠাৎ ট্রেনের শব্দ শুনতে পেয়ে বলে-"ঐ যে ট্রেনের শব্দ শুনছো, আমি ইচ্ছা করলে তা আমার বাড়ির কানাচে দাঁড় করাতে পারি"। জোবেদাও ক্ষুব্ধ হয়ে বলে-"দাঁড় করাও দেখি তোমার কত ক্ষমতা?" যেখানে এই বচসা হচ্ছে সেখান থেকে রেললাইন বড় জোর দু'শ গজ দূরে। তাই বাড়ির ভেতরে গিয়ে একখানি লাল রঙের কপড় নিয়ে লাইনে আসতে মুন্সির দেরি হলো না। কাপড়খানা মুন্সি লাইনের মাঝে দাঁড়িয়ে ওড়াতে থাকলে ট্রেনটি তার সামনেই থেমে গেল। ট্রেনের যাত্রীরা সবাই মনে করেছে যে হয়তো রেলের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, তাই লোকটি আসন্ন বিপদ হতে ট্রেনটি উদ্ধার করলো। ট্রেন থেকে টিটি সাহেব নেমে এসে মুন্সিকে বলল-"ভাই, সামনে কি লাইনের কোথাও সমস্যা দেখেছেন?"

-না।

-তাহলে ট্রেন থামালেন কেন?

-আমার ইচ্ছে হয়েছে তাই।

লেবু মুন্সির এই কথা শুনে টিটি সাহেব সজোরে মুন্সির গালে একটা থাপ্পর পুরস্কার দিয়ে গিয়ে ট্রেন ছেড়ে দিলো। মুন্সি ফিরে এসে জোবেদাকে তার ক্ষমতার চিহ্নের কথা বয়ান শুরু করল-"দেখলে তো ট্রেন দাঁড় করালাম।" জোবেদা স্নিগ্ধ ঠোঁটে ভ্রুকুটি কেটে বলল-"হ্যাঁ দেখলাম, টি.টি যে তোমাকে চড় মারছে এর জন্য, এইটাও দেখলাম।" মুন্সির চিরায়ত অভ্যাস কথায় হার না দেওয়া। তাই সে বলল-"আরে মাগী, আমার ক্ষমতা আমি দেখিয়েছি, আর টি.টির ক্ষমতা টি.টি দেখাইছে, বুঝলে তো!"

সময়ের সাক্ষ্যে

মোঃ জিল্লুর রহমান

তোমার অর্জিত সুখ ও দু:খ তোমার মাঝেই বিরাজমান। মৃত্যু অবধি বিরাজমান। ঢেয়ো নৌকার দু'ধারের মত, এক ধার যখন নিচু হয় তখন অন্য ধার উঁচু হয় পক্ষান্তরে অন্য ধারেরও একই অবস্থা। মবিন যুদ্ধে জয়লাভ করে ফিরে এসেছে। অনেক বন্ধুকে হারিয়েছে এবং নিজের বাজুতে গুলির এফোড়-ওফোড় ক্ষতটা আজও জখমের সাক্ষী রেখেছে। এখন আসল কথা হলো–জখম যখন তার চোখে পড়ে তখন কষ্টের কথা মনে হয়, সাথে সাথে মনে পড়ে যুদ্ধের কথা তারপর শত্রুর বুলেটের আঘাতে বন্ধুদের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার কথা। দু:খ হয় তার, কষ্ট হয়। অপরদিকে যুদ্ধে জয়লাভ করার কথাও তার মনে পড়ে, তাতে সুখবোধ ও আনন্দ দু-ই হয়। এর সাথে আরেকটা দু:খ তার মনে বাসা তৈরী করেছে সেটা হলো–যৌবনের উন্মাদনায় আন্‌তিকে মবিন খুব ভালোবাসতো এবং আন্‌তিও মবিনকে যথাসম্ভব জবাব দিতো। যখন সে ফিরলো তখন জানতে পারলো যুদ্ধ চলাকালীন সময়ের মধ্যেই তার বিয়ে হয়ে গেছে। আন্‌তিকে না পেয়ে মবিন খুব কষ্ট পায়, কষ্টের মাত্রা এমন যে, গুলির আঘাতে যে কষ্ট পাইলো তার থেকে শতগুন কষ্ট পাইলো। মনে হলো শত্রুর গুলি আঘাতে বন্ধুদের মৃত্যুবরণের চেয়ে এ আঘাতটা যেন আরো বেদনার। মবিনের মনের মধ্যে পাক খেতে লাগলো–যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করাই ভালোছিলো, কিসের যুদ্ধ,কিসের দেশ?

পরের বছর মবিন বিবাহে আবদ্ধ হয়। একে একে সন্তানের সংখ্যা দাঁড়ায় গোটা পাঁচেক তার মধ্যে দুটি সন্তান মারা যায় অকালে। একটা পাঁচ বছর ও আরেকটি সাত বছর বয়সে। আর তিনজন উচ্চ শিক্ষিত হয়। তারা উচ্চপদস্থ চাকুরী করে। মাঝে সংসার থেকে মবিনের বাবা বিয়োগ হয় বড় ছেলের বিবাহের এক বছরের মাথায়।

মবিন এখন একেবারেই বৃদ্ধ। পর্যাপ্ত সময় নিয়ে সে এখন শুধু জীবনের আনন্দ দুঃখের হিসাব কসার সুযোগ পেয়েছে যেন। খুঁজে খুঁজে বের করে খুঁটি নাটি আনন্দের মুহুর্তকে অথবা বেদনাকে। ভেবে কষ্টও পায় সুখও পায়। আনুসঙ্গিক যে কাজগুলো করে এখন তার খাজে খাজে সে দেখতে পায়, স্পষ্ট দেখতে পায়-বাল্য কালের, কৈশরের, যৌবনের, মধ্যবয়সের সব আনন্দ ও বেদনাগুলো যেন হা করে তার চোখের তারায় ঠিকরে আছে। এক গ্লাস পানি খেতে গেলে কত কথা মনে পরে তার-হয়তো কাঁচের গ্লাসটা ভেঙ্গেছিলো সেই বাল্যে অথবা একদিন রাতে বউ গ্লাস ভর্তি পানি হাতে হারিকেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সে আলোয় বউয়ের মুখটি সুন্দর দেখাচ্ছিল। মনে পড়ে যে খাটে মবিন এখন ঘুমোয় সেটাতে কড়া পোকায় কাটে-তাতেও মনে হয় অনেক কথা। তার বাবা এই খাটটা ছোট ছেলে হিসাবে তাকে দিয়েছিল। খাটটা কাঁঠাল কাঠের তৈরী এবং কাঠগুলো ছিল মবিনের দাদার নিজের হাতে লাগানো গাছের। এইভাবে যখনই যা ঘটে তাতেই পূর্ব স্মৃতি মনে পড়ে তার। হঠাৎ জোরে কাঁশলে-কাঁশি নিয়েই কত কাহিনী। সেন্ডেলের ফিতা ছিঁড়ে গেছে অথবা একদিন চারশত টাকায় সেন্ডেল ক্রয়-তাতেও কত গল্প। যেন বিরতিহীনভাবে কেটে যায় তার পৌঢ় দিনগুলি এসব কথা ভেবে ভেবে। অবসর নেই সামনের দিনগুলো নিয়ে ভাবার।

অলংকরণ: সাহানাজ

শিবলী নোমান

হাসান আজিজুল হক: জীবন্ত কিংবদন্তি

গত ২রা ফেব্রুয়ারি ছিল বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এর ৬৮তম জন্মদিন। আরো দীর্ঘদিন তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

রাজশাহীর রাস্তায় প্রায়ই তাকে দেখা যায়। হেঁটে যাওয়া অসংখ্য মানুষের ভিড়ে তাকে আলাদা করে চেনার উপায় নেই। একটানা ৩১ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভর্তি হওয়া তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যকে লালন করে পথ দেখিয়ে গেছেন তিনি তাদের, মানুষ হওয়ার দীক্ষা দিয়ে। গণমানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে রাষ্ট্র যখন নিপীড়কের ভূমিকায় তখনও তিনি মানুষের মাঝেই থাকেন, তিনি ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে আসেন, সোচ্চার হন। এভাবেই মানুষের মাঝে এগিয়ে থাকেন তিনি। এরপর ফিরে যান তার টেবিলে। নিবিষ্ট মনে তিনি লিখে চলেন মানুষের কথা। মানুষের মাঝে থেকে তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গী তাকেই তো হতে হবে; কারণ নিজের সম্পর্কে তার মূল্যায়ন হলো- 'অভিজ্ঞতার বাইরে আমার উদ্ভাবনী ক্ষমতা শূন্য।' তিনি আমাদের হাসান আজিজুল হক। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের জগতে এক জীবন্ত কিংবদন্তি তিনি। গত অর্ধশতাব্দী ধরে হাসান আজিজুল হকের গল্পে বাংলার সমাজ জীবনের যে চিত্র উঠে এসেছে তা বাংলা সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ বটে। 'বাংলা সাহিত্যের জীবন্ত কিংবদন্তি' এমন বিশেষণ কখনো তাঁর সামনে উচ্চারিত হলেও তিনি জোরেশোরে মাথা নাড়ান। এমন ধারায় তিনি স্বস্তি পান না, তাও বলে দেন পরিষ্কারভাবে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব সমাজের ভেতর-বাইরে যে বদল হয়েছে তাঁর কাছে সেই বদলে যাওয়াটা শুধু লেখারই উপজীব্য নয়, নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এর সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নেওয়াও। এ কারণেই তাঁর লেখাগুলো তাঁর কাছে নিরীক্ষা হলেও প্রকাশের পর এর বেশিরভাগের আবেদনই হয়েছে কালোত্তীর্ণ। হাসান আজিজুল হক এখানেই অন্যদের থেকে আলাদা। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তাঁর গদ্যচর্চার বিষয়, চরিত্র-চিত্রণ ও নির্মাণশৈলী প্রমাণ করে, কথাসাহিত্যের প্রচলিত ধারাগুলোকে তিনি বারবার নতুন নতুন পরীক্ষার সামনে দাঁড় করিয়েছেন। শুধু সাহিত্যের প্রচলিত

ধারাগুলোই নয়, তিনি বারবার পরীক্ষার মুখোমুখি করেছেন নিজের লেখাগুলোকেই। সেই অর্থে হাসান আজিজুল হক একদিকে যেমন ভাষার সুনিপুণ শিল্পী, অন্যদিকে তেমন উৎকৃষ্ট সমালোচকও বটে। হাসান আজিজুল হকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তাঁর এই সমালোচনা থেকে রেহাই পাননি তিনি নিজেও। তা করতে গিয়ে তিনি নিজেই নিজেকে ভেঙেছেন, আবার পরমুহূর্তেই নতুন করে গড়েছেন। ১৯৬০ সালে তাঁর লেখা 'বৃত্তায়ন' নামক উপন্যাসটিকে সে কারণে তিনি নিজেই কঠোর সমালোচনা করার সাহস দেখিয়েছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সময়ের ধারায় 'বৃত্তায়ন'কে তিনি উপন্যাস বলেই মানতে রাজি হন নি। শুধু এই একটিতেই নয়, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রসঙ্গেও তিনি নিজের লেখার সমালোচনা নিজেই করেছেন। ইলিয়াসের প্রথমদিককার লেখা নিয়ে হাসান আজিজুল হকের যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, সময়ের প্রবাহে তা যে বদলের প্রয়োজন, সেই উপলব্ধি থেকে তিনি আবার ইলিয়াসকে নিয়ে নতুন করে লিখেছিলেন। ইলিয়াসের মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ছাপা হয়েছিল পরের লেখাটি।

নিরীক্ষাপ্রবণ এ মানুষটির কাছে কিন্তু একটি বিষয় সবসময় অভিন্নই থাকে। সেটি হলো মানুষ। সময় আর সমাজ ভিন্ন হতে পারে। ভাষা আর সংস্কৃতি ভিন্ন হতে পারে। কালের প্রবাহে রাষ্ট্র বদলে যেতে পারে, কিন্তু হাসানের দৃষ্টিতে মানুষ সবসময়ই এক। কারণ, মানুষের একেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সর্বজনীন। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যই মানুষকে এক রাখে। হাসান আজিজুল হক তাঁর লেখায় সবসময় সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সেই মানবসত্তাকেই তুলে ধরেছেন। সেই মানুষের ভেতর-বাইরের সব সত্তাকে হাসান তুলে ধরেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। সেই ভঙ্গিটা তাঁর নিজের বটে, তবে একেক রচনায় তা সেই রচনার চরিত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েই বিকশিত হয়। তাঁর সব শেষ প্রকাশিত উপন্যাস 'আগুনপাখি'তে সে কারণেই আমরা দেখি, কীভাবে তাঁর কেন্দ্রীয় চরিত্রের নারীটি নিজের আঞ্চলিক ভাষায় এক জীবনের সব বয়ান তুলে আনছে। সেই বয়ানে মধ্যবিত্তের দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অনুপস্থিত। কারণ, মধ্যবিত্তের তথ্য-চাহিদা হাসান মেটাননি। তিনি দেখিয়েছেন, উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নিজের দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে একেকটি ঘটনাকে ব্যাখ্যা করে, তাদের চোখে ধরা দেওয়া গুরত্ব অনুযায়ী সেগুলোকে সাজিয়ে মানুষকে শোনায়। 'শকুন' গল্পে (সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরণ্য) সুদখোর মহাজনদের মাধ্যমে আমাদের গ্রামীণ সমাজে বিরাজমান শোষণের চিত্র তিনি তুলে এনেছেন। সময় বদলে গেছে। সুদের সেই ধরণ হয়তো নেই। কিন্তু আজো সেই শোষণ আছে। সে কারণেই তাঁর সেই গল্প কালোত্তীর্ণ। 'আত্মজা ও একটি করবী গাছ' গল্পে নিজের মেয়ের মাংস বিকানো সেই উদ্বাস্তু মানুষটির জীবনের গ্লানি একইভাবে ছুঁয়ে যায় সময়কে।

হাসান আজিজুল হক নিজের লেখায় শুধু মানব বৈশিষ্ট্যের সেই সর্বজনীনতাকেই তুলে ধরেন না, সেই অভিন্ন মানুষের অধিকার আর মুক্তির আন্দোলনে নিজেকে নিয়োজিত করেন সর্বস্ব দিয়ে। এ কারণেই মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর হুমকিতে বারবার তিনি বিদ্ধ হয়েছেন। সমাজের অন্ধত্ব আর গোঁড়ামিকে নিঃশঙ্কচিত্তে তিনি তুলে এনেছেন সবার সামনে। এভাবেই আরো দীর্ঘদিন আমাদের মাঝে থাকবেন হাসান আজিজুল হক-তাঁর ৬৮তম জন্মদিনে এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

হাসান আজিজুল হক তাঁর লেখায় সবসময় সাধারণ বৈশিষ্ট্য, সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের সেই মানবসত্তাকেই তুলে ধরেছেন। সেই মানুষের ভেতর-বাইরের সব সত্তাকে হাসান তুলে ধরেন তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে। সেই ভঙ্গিটা তাঁর নিজের বটে, তবে একেক রচনায় তা সেই রচনার চরিত্রের সঙ্গে মিলে গিয়েই বিকশিত হয়।

বিমূর্তনের পরিধি অনুভব

মইনুদ্দীন খালেদ

শিল্পীমন বস্তুর অন্তরলোক উন্মোচন করতে চায়। বস্তুর উপরিতল হয়তো তার প্রাথমিক বিবেচনা, কিন্তু তারপর সে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর স্তরে আশ্রয় নেয়। মানুষের জীবন ও বস্তুপৃথিবীর রহস্য উন্মোচন সৃষ্টিশীলতার প্রধান শর্ত। শিল্পরচনার অভিযানে একেক মাধ্যমের শিল্পী একেকভাবে পথ খুঁজে নেয়। তেল জলে যারা কাজ করে তাদের থেকে ভিন্ন সূত্র ধরে এগোতে হয় প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রের শিল্পীদের। তেলের ও জলের স্বভাব না জেনে এসব মাধ্যমের চিত্তাকর্ষক কাজ যেমন তৈরী করা সম্ভব নয় তেমনি কাঠ ও ধাতব পাতের সঙ্গে এক কঠিন সংগ্রাম করে ছাপচিত্রে শিল্পমান যুক্ত করতে হয়। মেহেদী ছাপচিত্রের শিক্ষার্থী শিল্পী। শিক্ষা জীবনের সমাপ্তি-লগ্নে বোঝা যায় কার কেমন শিল্পদৃষ্টি ও শৈল্পিক দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। এ বিবেচনায় মেহেদীর কাজ অনেক ধাপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির দিগন্তকে স্পর্শ করতে সম্ভব হয়েছে। মাধ্যমের প্রকৃতি না বুঝলে যে সত্যিকার প্রিন্টমেকিং এর শিল্পী হওয়া সম্ভব নয় তা তিনি উডকাট ও এচিং করে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছেন। মেহেদীর কাজ ক্রম বিকাশমান এই নবীন শিল্পী একই সঙ্গে গভীরভাবে কায়িকশ্রমেক্লিষ্ট মানুষকে দেখেছেন, আবার স্বপ্নময়তাও এঁকেছেন। তার স্বপ্নময়তা তাকে পারাবাস্তবতা ও অতিপ্রাকৃত অবস্থার মধ্যে নিয়ে এসেছে। দালি ও গয়্যার কাজের ছায়া আছে তার কাজে। নবীন প্রাণ শিল্পের সবচেয়ে শিহরিত পর্বে গিয়ে দোলা খেতে চায়। এ জন্যই উল্লিখিত ওই দুই শিল্পী হয়তো তাকে আলোড়িত করে থাকবে। তবে উডকাটের চেয়ে এচিং-এ মেহেদী পারমিতা প্রদর্শন করেছেন বেশি। সুনির্দিষ্টভাবে কোনো পরিচিত বিষয় নয়। শুধু মিহি ও মোটা রেখার জাল বুনে ও নানা আয়তনের গড়ন গড়ে বস্তুনিরপেক্ষ শিল্প সৃষ্টি করার প্রয়াস পেয়েছেন এই নবীন। ধাতবপাতে অম্লের স্পর্শ ও তার গায়ে বিবিধ আঁচড় বলে দেয় নিরাবয়ব ধ্বনিময়তার একটা আবহ রচনা করতে চাচ্ছেন মেহেদী। টেক্সচারে মাহাত্য বিবিধ অয়তনের গড়নের মধ্যে সম্বন্ধ ও ভারসাম্য, উজ্জ্বল ও অনুজ্জ্বল স্পেসের মেলবন্ধন, এসবের হিসাব মেলানো দূরূহ কাজ। কতটুকু কাজ করলে পরিমিতিবোধের প্রকাশ ঘটবে শিল্পরচনার এই সিদ্ধান্ত নেয়ার সাহস তার কাজে খুঁজে পাওয়া যাবে। মেহেদী ধাতবপাতের আক্‌লি-বিক্‌লির মধ্যে মনটাকে স্বতস্ফূর্তভাবে খেলাতে পেরেছেন। অনুভূতিকে স্বাধীনভাবে বিচরণশীল দেখানোর জন্য ধাতবপাতে অম্লস্পর্শের নিয়ন্ত্রণে বিশেষ দক্ষতা প্রয়োজন। শিল্পের এই কঠিন যাত্রায় মেহেদী স্থিরপ্রতিজ্ঞ ও সৃষ্টির রহস্য তিনি ইতিমধ্যেই অনুভব করতে পেরেছেন। গত ১লা নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের জয়নুল গ্যালারীতে সপ্তাহব্যাপী মেহেদীর একক ছাপচিত্রকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেদী হাসান, ইমেজ অব ইমাজিন্‌ড, ড্রাইপয়েন্ট, ২০০৭

ধূলোমাখা আদুল গায়ের স্মৃতি তাড়না

জা হি দ মু স্তা ফা

অনুকূল, প্যাসিওনেট ওম্যান-৪, চারকোল অন পেপার, ২০০৭

তাঁর আঁকা ছবি দেখতে চলে যাই দূর গাঁয়ে-শৈশবের মেঠো পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যেন পৌছে যাই মায়ের আদর মাখা কোলে। পরম শান্তির সেই আশ্রয় কে না খোঁজে, কে না চায় বৈশাখী হাওয়ায় আম কুড়ানোর সুখ পেতে।

শৈশবে সেই উঠোনে, মায়াময় দাওয়ায় অপত্য স্নেহময়ী মা'র কোলে অবুঝ শিশু। সে যখন চলতে পারে, ঘোরে মা'র পায়ে পায়ে। সে যখন আরেকটু বড়-যায় পাঠশালায়, সমবয়সীদের খেলা ক'রে, দুষ্টুমি ক'রে, ধূলোমাখা গায়ে বাড়ি ফেরে, পরম হিতৈষী মা'র আঁচলে লুকায়। আমাদের স্মৃতির সেলুলয়েডে এসব টুকরো টুকরো স্মৃতি চোখে মেখে দিয়েছেন পথের পাঁচালীর বিভূতিভূষণ হয়ে সত্যজিৎ রায়। আমাদের অস্তিত্বের ভেতরে ডুবে থাকা সেই অপু, সেই দুর্গা সেই স্নেহশীলা মাতৃমূর্তি সর্বজায়া যেন নিশ্চিন্দিপুরের নিবাস ছেড়ে উঠে এসেছে অনুকূলের চিত্রপটে।

বিস্তীর্ণ বাংলার অন্ত্যজ মানুষের সঙ্গে গভীর এক অন্তমিল আছে বাঘেরহাটের অনুকূলের। তারা গাঁয়ের মাটি ছানা, ধূলো মাখা আদুল গায়ের স্মৃতিতাড়িত মানুষ। এঁকেছেন ঢোলবাদনের দৃশ্য, এঁকেছেন নারী পুরুষের চিরন্তন শরীরী প্রেম। সিক্ত বাসনা নারীর ঘরে ফেরার এস্ত্রতাও দৃষ্টি এড়ায়নি তাঁর। সে রেখার খেলায় মেতে উঠেছেন অনুকূল। সে রেখা দ্রুতগামী, বড় অনুসন্ধিৎসু। সে রেখার আশেপাশের জমিনে শান্তিপ্রিয় সৌম্য রঙ। সে রঙ কখনো ধায় সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে, তখন সে অস্থির আনন্দময় হয়ে ওঠে।

গত ৭ ফেব্রুয়ারি ধানমন্ডির শিল্পাঙ্গন গ্যালারিতে তরুণ শিল্পী অনুকূল মজুমদার-এর দুই সপ্তাহব্যাপী একক চিত্রকর্ম প্রদর্শনী শুরু হয়।

অন্ধকার নর্দমাশিল্প

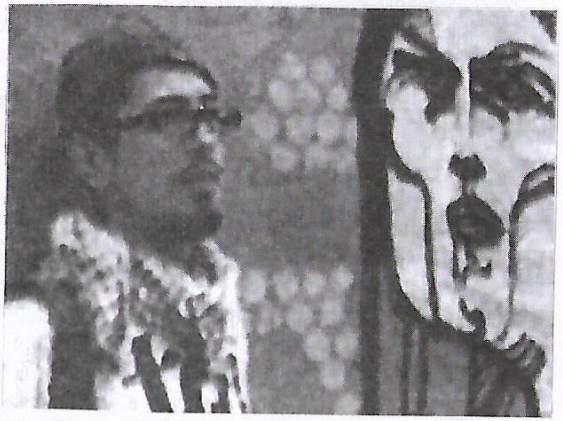

ব্যতিক্রমী চিন্তার শিল্পী জিজাও

কোনো বিখ্যাত গ্যালারি বা প্রাসাদে নয়, কোনো খোলা মাঠেও নয়, অন্ধাকার টানেল, দম বন্ধ হওয়া স্যাঁতসেঁতে আর গুমোট পরিবেশে হতে যাচ্ছে ছবির প্রদর্শনী। আর এ প্রদর্শনীর আয়োজন করতে যাচ্ছেন ব্রাজিলের প্রখ্যাত দেয়ালচিত্র শিল্পী জিজাও। যেখানে সাধারণত কোনো শিল্পী তার শিল্পকর্ম গুলোকে দেখাতে পছন্দ করবে না। কিন্তু জিজাও তার ব্যতিক্রম। নগরীর সাও পাওলো রাস্তার টানেলের নিচে এ জায়গাটি ভীষণ অন্ধকার, স্যাঁতসেঁতে, পিচ্ছিল ও বিপজ্জনক। এখানকার পানি দুর্গন্ধময় ও বাদামি রঙের। প্রচুর বৃষ্টিপাত হলে এ জায়গাটা পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। জিজাও এখানে কাজ করতে গিয়ে প্রচুর কষ্ট করেছেন। জায়গাটা রোগ-জীবাণুতে পরিপূর্ণ। তাই তিনি প্রতিষেধক টিকা নিয়েছেন, যা তাকে সংক্রামক রোগ থেকে বাঁচাবে। এ টানেলে বাস করে ইদুরসহ নানা প্রাণী। কিন্তু কথা হচ্ছে, এত জায়গা থাকতে জিজাও কেন সেই অন্ধকার টানেলে তার শিল্পকর্মের প্রদর্শনী করতে যাচ্ছেন? কারণ অবশ্যই আছে আর তা হলো-শহরের এ জায়গাটি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে আনা। টানেলের এই বিচ্ছিরি অবস্থা সম্পর্কে কর্তৃপক্ষকে একটু সচেতন করে দেওয়াই তার উদ্দেশ্য। আর এর সঙ্গে হয়ে যাচ্ছে তার ব্যক্তিগত একটি ভিন্ন ধরনের কাজও। জিজাওয়ের এমন কাজ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে শিল্পপ্রেমীদের। তাকে এ কাজে সহায়তা করেছেন শহরের আরেকজন প্রখ্যাত দেয়ালচিত্র শিল্পী ট্রিটিফ্রেক। দেয়ালচিত্র সম্পর্কে সেখানে সাধারণের তেমন কোনো ধারণা নেই। এ প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণ সচেতন হবে। এ প্রদর্শনী সম্পর্কে একজন শিল্পপ্রেমী বলেন, এ ছবিগুলো শহরের নোংরা-আবর্জনা প্রমাণ করবে। সাও পাওলো জাদুঘর কর্মকর্তারা বলেন, এ ধরনের কাজ অবশ্যই মুল্যবান ভূমিকা রাখবে। জাদুঘরের পরিচালক লিসবেহহা রিবোলো গণকালভস বলেন, নাগরিক জীবনে শৈল্পিক বহিঃ প্রকাশের জন্য দেয়ালশিল্প অন্যতম এক মাধ্যম। এ ধরনের কাজে সবাই এগিয়ে আসতে পারে না। অভিনব এ প্রদর্শনীর কথা শুনে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে শিল্পীরা এখানে আসছেন। নিউইয়র্কের শিল্পী জোনাথন লি ভাইন বিশ্বাস করেন, সাও পাওলোর আলাদা একটি মূল্য বা চাহিদা রয়েছে। এখানকার লোকজন হয়তো খুব বেশ অর্থের মালিক নয় কিন্তু এ প্রদর্শনী জনগণের কাছে শিল্পীর পরিচিত হওয়ার অন্যতম এক পন্থা। দেশ থেকে দেশে ও শহর থেকে শহরে এ ধরনের কাজ যারা করছে তারা সত্যিই প্রশংসারযোগ্য।

তাসনিম মৌটুসী (সূত্রঃ সমকাল)

স্থাপনাশিল্প : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মনির উদ্দীন আহাম্মেদ টভেল

প্রত্যেক মানুষেরই নিজস্ব চিন্তা চেতনার ক্ষেত্র হয় অনেক বিস্তৃত। মৌলিক চিন্তা-চেতনার প্রাধান্য দেওয়া হয় সর্বাগ্রে। আধুনিক চিত্রশিল্প চতুষ্কোণিক ক্যানভাসের আয়তক্ষেত্র ছেড়ে অর্জন করে বহুমাত্রিকতা। শিল্পীরা শুরু করে শিল্পকলা নিয়ে নানা নিরীক্ষা। এই নিরীক্ষারই ফসল স্থাপনাশিল্প। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অরাজক পরিস্থিতি এবং হতাশা স্থাপনাশিল্প এর ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করার প্রধান কারণ। এছাড়া সব কিছুর মতো শিল্পীদের মধ্যে স্বাভাবিক পরিবর্তনের মানসিকতা দেখা দেয়।

স্থাপনাশিল্প বা ইনস্টলেশন আর্ট এর যাত্রা শুরু মার্শাল দ্যুশা এর হাত ধরে এবং জোশেফ বাউস এর কথা ও সেই সঙ্গে উল্লেখ করা যায়। আপাত সামঞ্জস্য জিনিসপত্র দিয়ে যা তৈরী করা হয় তা যতটা প্রতীক ততটা নান্দনিক নয়। জোশেফ বাউস এর কাছাকাছি আসেন কাউনেলিস্ এবং সত্তর দশকে ইতালীর আর্ট পোভেরা-যারা নানাভাবে শিল্পীদের মধ্যে বন্ধনমুক্তির ছোঁয়া এনে দিয়েছিলেন। সত্তর দশকের ইনস্টলেশনগুলো ছিলো রাজনৈতিক দ্বান্দিক প্রকৃতির-অর্থাৎ সমসাময়িক জীবনের সচেতন অনুকরণ। শিল্পী জুডি চিকাগো (১৯৩৯) এর অসাধারণ স্থাপনাশিল্প ছিল ঐ সময়ের জীবন্ত ইতিহাস।

পাশ্চাত্য পৃথিবী সাম্প্রতিক বাংলাদেশের শিল্পকে বিশেষ কয়েকটি কারণে সমালোচনা করে থাকে। তার মধ্যে প্রধানতম কারণটি হলো এই যে, সুবিপুল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও একমাত্র লোকশিল্প বা লোকচিত্রকলা বাদ দিয়ে এমন কিছু নতুন শিল্পধারা তৈরী করতে পারেনি যা আন্তজার্তিক অঙ্গনে সাড়া জাগাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শিল্পে ইতিমধ্যেই এক প্রগাঢ় ক্লান্তির ছাপ পড়ে গেছে যা থেকে বেড়িয়ে আসার কোন সাম্প্রতিক লক্ষণ দৃষ্টি গোচরতায় নেই। মার্শাল দ্যুশা থেকে হার্স্ট পর্যন্ত কনসেপচুয়াল আর্টের বিশেষণ করে দেখা যাচ্ছে শিল্প যে গতি পথই গ্রহণ করুক না কেন তাকে হতে হবে দেশজ সংস্কৃতির কাছে দায়বদ্ধ। শিল্প যেমন কল্পনা তেমনি বিশেষ মুহূর্তের দলিল। আর ঠিক এই কারণেই এই মুহূতে বাংলাদেশে ইনস্টলেশন আর্টের হিড়িক পড়েছে তাতে প্রবল সন্দেহের অবকাশ রয়েছে যে, এই ধারাটা বেশি দিন টিকবে কি না? এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বিখ্যাত ও অখ্যাত যে সব শিল্পীদের ইনস্টলেশন আর্ট প্রদর্শনী হয়েছে তা প্রকৃত পক্ষে একই ধরণের কাজের পূনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। তার অন্যতম প্রধান কারণ অধিকাংশ বাংলাদেশী শিল্পীদের স্থাপনাশিল্প বা ইনস্টলেশন আর্ট সম্পর্কে স্পষ্ট কোন ধারণা নেই। প্রাচুর্য আর অপচয়ের পরিবেশে 'ইনস্টলেশন'র জন্ম। তাই দারিদ্র, যা প্রতি মুহূর্তে বাঙালির জীবনের বাস্তবতা, স্থাপনাশিল্প চর্চার পরিপন্থী। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ব্যাপারটাই অনেকটা বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। তাই সেই শিল্প যা মূলত আত্মধ্বংসী তা প্রকৃতপক্ষে সমাজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক প্রত্যক্ষ বিদ্রুপ। অপচয় নয়, অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসকেও যত্ন করে শিল্প সৃষ্টি করা বাংলাদেশের মানুষের বৈশিষ্ট্য। বাংলাদেশের বর্তমান কালের শিল্প পরিবেশের দিকে দৃষ্টি ফেরালে যে কেউই বুঝতে পারবেন কীভাবে প্রায় মধ্যযুগীয় জিনিসপত্র দিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশী শিল্পকর্ম গড়ে উঠছে। মিতব্যয়িতার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হলো বাংলাদেশের 'কাঁথা' শিল্প। এই শিল্প সৃষ্টি হয় গ্রাম্য মহিলাদের ব্যবহৃত পুরনো শাড়ী, চাদর এর উপর শাড়ীর পাড়ের রঙিন সুতা দিয়ে। এই সব কাঁথাতে দৃষ্টিনন্দন এবং আলঙ্কারিক নকশায় যেভাবে নানা পৌরাণিক ও ধর্মীয় কাহিনী এবং লোকগাঁথা তুলে ধরা হয় তা আক্ষরিক অর্থেই দেশজ। বাংলাদেশের শিল্পের এই অনুপম উদাহরণটি সমসাময়িক কালের পৃথিবীর বিখ্যাত অনেক মিউজিয়ামে জায়গা করে নিয়েছে। উপযুক্ত উদাহরণ এটাই প্রমাণ করে যে বাংলাদেশে ইনস্টলেশন আর্ট একেবারেই অসম্ভব কিছু নয়। কারণ ইনস্টলেশন শুধুমাত্র অপচয়ের শিল্প নয়, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছতম উপকরণও তার মাঝে জায়গা করে নিতে পারে।

চারিদিকে বিশাল চোখ ধাঁধাঁনো সিনেমার হোর্ডিং, প্রসাধনী সামগ্রীর বিজ্ঞাপনচিত্র, বাস, ট্রাক, এবং রিকশার গায়ে আঁকা অপটু হাতের ছবি, নিত্য নৈমত্তিক তারকাদের আবির্ভাব এইসব বিপুল শিল্পসম্ভারের মাঝেও বাংলাদেশের ইনস্টলেশন শিল্পীরা পারিপার্শ্বিকের প্রতি আশ্চার্য রকম উদাসীন। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায়ের দূর্গা প্রতিমা তৈরী এবং এর বিসর্জন ইনস্টলেশন আর্টের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হতে পারে। তদুপরি এই শিল্পধারা থেকে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি।

যদিও সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী সমূহে বাংলাদেশের স্থাপনাশিল্পের উন্নতর একটা মান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিল্পী কামরুল হাসানের "অক্ষর বৃক্ষ" দিয়ে যে শিল্পের সূচনা হয়েছিল এবং তৎপরবর্তী কালে ভাস্কর হামিদুজ্জামান খান অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছিলেন এই শিল্পধারাকে। এরপর শিল্পী নিসার হোসেন, মাহবুবুর রহমান প্রমূখ শিল্পীরা যোগ দিয়েছেন এই শিল্প আন্দোলনে। এই ধারার আর একজন সফল শিল্পী ঢালী আল মামুন। এ প্রসঙ্গে ১০ম এশীয় চারুকলা প্রদর্শনীর বাংলাদেশী শিল্পীদের কাজ নিয়ে আলোচনায় আসে শিল্পী ঢালী আল-মামুনের কাজ। যার কাজ সমকালীন রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি নিজেকে এ সময়ের একজন সফল নিরীক্ষাধর্মী শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাম্প্রতিক রক্তপাত ও উগ্র ধর্মীয় জঙ্গিবাদের উত্থান তার কাজের বিষয়বস্তু। তিনি বর্তমানে চিত্রকলা অপেক্ষা স্থাপনাশিল্পের উপরই বেশি মনোনিবেশ করেছেন। তিনি ২০০০ সালে জাতীয় চারুকলা প্রদর্শনীতে প্রথম পুরষ্কার লাভ করেন। তার স্থাপনাশিল্পের শিরোনাম Dialouge। তিনি তার শিল্পকর্মে কথোপকথন ও সংঘর্ষের কথা বর্ণনা করেছেন। দন্ডায়মান ফিগারগুলো ধর্মান্ধ লোকদের প্রতীক রূপে চিহ্নিত। এবারেই প্রথম বাংলাদেশের শিল্পীরা স্থাপনাশিল্পের জন্য শিল্পকলা একাডেমীর গ্যালারির বাইরে একটি বড় স্পেস পান। সাইদুল হক জুইস, অশোক কর্মকার, খালিদ হাসান মিঠু, মাহবুবুর রহমান, তৈয়বা বেগম লিপি প্রমূখ শিল্পী তাদের স্থাপনাশিল্প উপস্থাপন করেন।

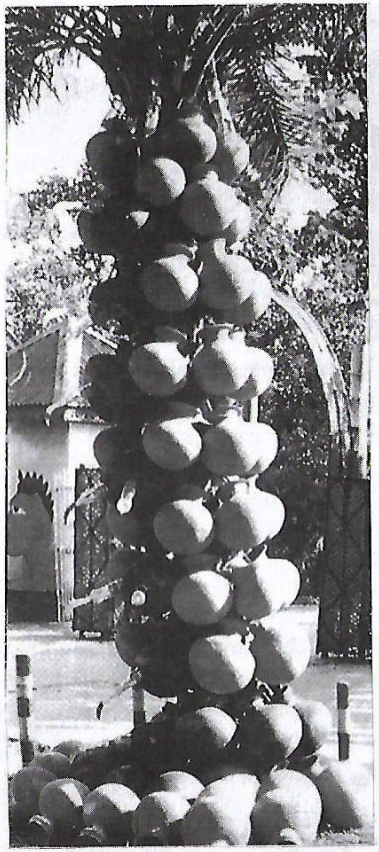

শিল্পী ঢালী আল মামুন, হিস্ট্রি অব পাম ট্রি

এদেশের শিল্পীরা দৈনন্দিন বর্ণময় জীবনের মধ্যেই সে তার শিল্পের উপকরণ ও বিষয়বস্তু খুঁজে নিতে পারে। বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মঞ্চ, বিভিন্ন মনোহারী দ্রব্যের দোকান এর সাইনবোর্ড, সিনেমার ব্যানার এবং বাণিজ্যিক পণ্যের হোর্ডিং সবকিছুই বিচ্ছিন্নভাবে এবং সামগ্রিকভাবে এক প্রাণবন্ত শিল্পের নিদর্শন। পলায়নমুখিতা নয়, জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরাই বাংলাদেশী শিল্পের বৈশিষ্ট্য। তবে ইনস্টলেশন আর্টকে অর্থাৎ এই উত্তর আধুনিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে আরও কিছু সময় অপেক্ষা করে থাকা ছাড়া কোনো উপায়ন্তর নেই।

মাটি খোদাইকৃত শত শত মুখ

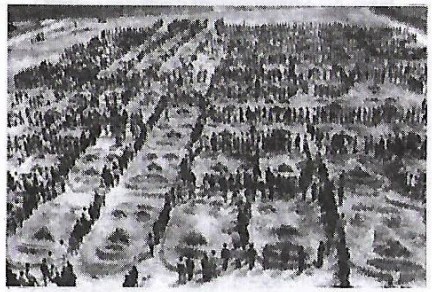

৩০ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিশাল এক শিল্পকর্ম তৈরী করেছেন চীনের ওয়াংগাং। আর এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছেন শিল্পকলার তিন হাজার ছাত্র। তাঁরা সবাই মিলে পুরো এলাকার মাটি খোদাই করে তৈরী করেছেন একশ মুখ। চীনের অর্থনীতিতে কৃষকের অবদানকে শ্রদ্ধা জানাইতেই এই কাজটা করেছেন তাঁরা।

ভিঞ্চির হেলিকপ্টার ও প্যারাস্যুট নক্শা

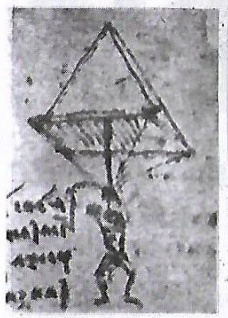

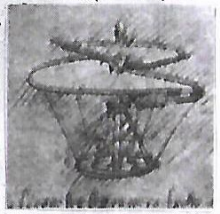

খ্রিষ্টের ৪০০ বছর পূর্বে চীনে বাঁশের তৈরী উড়ন্ত খেলনা ছিল। ৪র্থ শতাব্দীতে চীনে ঘুর্ণনক্ষম ডানার ধারণার উৎপত্তি হয়। এটি পরে ইউরোপে সম্প্রসারিত হয় যা ১৪৬৩ সালের একটি পেইন্টিংয়ে দেখা যায়। তবে কিছুটা বাস্তব সম্মতভাবে প্রথম হেলিকপ্টারের নক্শা প্রস্তুত করেন বিখ্যাত শিল্পী লিওনার্দো দ্যা ভিঞ্চি ১৪৯০ সালে। এছাড়াও প্যারাস্যুট নক্শাটিও তাঁর অংকিত ॥

কে ভেঙেছিল সোমনাথ মন্দির?

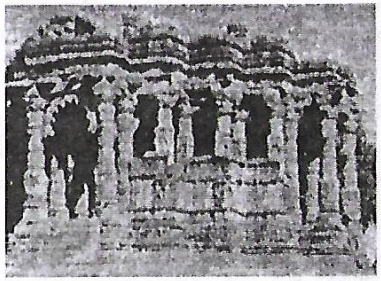

কিংবদন্তি মতে, চন্দ্র দেবতা সোসরাজ নিজে এই সোমনাথ মন্দির সোনা দিয়ে তৈরী করেন। এরপর লঙ্কার রাজা রূপা দিয়ে, কৃষ্ণ কাঠ দিয়ে এই মন্দিরটি তৈরী করেন। তবে অনুমান করা হয়, ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজা ভীমদেবের সময় এই সোমনাথ মন্দিরটি তৈরী করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বারবার এ মন্দিরটি লুণ্ঠনের শিকার হয়েছে। ১০২৪ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ আর লুণ্ঠন চালিয়ে মন্দিরটি নিশ্চিহ্ন করে দেন। মাহমুদের ধ্বংসের পরও মন্দিরটি নতুন করে নির্মাণ করা হয়। ১৭০৬ সালে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এটি আবার ধ্বংস করে দেন। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর মন্দিরটি আবার তৈরীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মন্দিরটি পূনর্নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৫ সালে। মন্দিরটি এমন স্থানে স্থাপিত যে, মন্দির আর পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু অ্যান্টার্কটিকার মধ্যে বিশাল জলরাশি ছাড়া কোন স্থলভাগ নেই।

সবচেয়ে পুরনো তৈলচিত্র

আফগানিস্তানের বামিয়ান প্রদেশের পার্বত্য গুহায় প্রত্নতত্ত্ব গবেষকরা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো তৈলচিত্রের সন্ধান পেয়েছেন। জাপান, ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের একদল প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ সম্প্রতি সাংবাদিকদের এ কথা জানান। জাপানী প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ ইউকো তানাগুছি জানান, বামিয়ান পাহাড়ের গুহায় খুঁজে পাওয়া তৈলচিত্রটি ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে আঁকা। ছবিতে দেখা যায়, একদল মাথা মুড়ানো বৌদ্ধ যোগী সিঁদুর পাত্রের চারপাশে বৃদ্ধাসনে বসে ধ্যানে মগ্ন রয়েছেন।

মাটির নিচে সেনাবাহিনী !

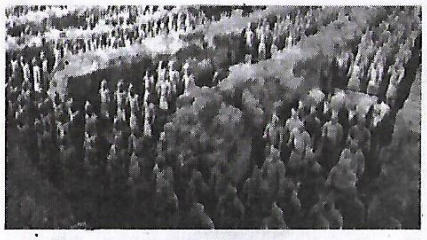

মাটি খুঁড়ে সোনা, তামা, হীরা, কয়লা ইত্যাদির খনি পাওয়া যায়। এ তথ্য সবার জানা। তাই বলে, সেনাবাহিনী? হ্যাঁ, চীনের শানঝি প্রদেশের জিয়ান শহরের কাছে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে বিশাল এক সেনাবহর। তবে এ সেনাবাহিনী জলজান্ত মানব কিংবা মানব কঙ্কাল নয়। এগুলো শিল্পীর নিখুঁত হাতে তৈরি পোড়ামাটির সৈন্য-সামন্তের দল। মোট ৮ হাজার ৯৯টি পোড়ামাটির সৈন্য সারিবদ্ধভাবে সাজানো আছে এখানে, যেন তারা কুচকাওয়াজে অংশ নিয়ে লেফ্ট-রাইট করছে। ঐতিহাসিকরা গবেষণা করে বের করেছেন ওই সৈন্যদল সম্রাট কিনের আমলে তৈরি। কিন রাজবংশের প্রথম পুরুষ কিন শি হুয়াং খ্রিষ্টপূর্ব ২১০ থেকে ২০৯ সালে এ সেনা দল তৈরি করেন। এগুলো 'কিনস ইরবহ' নামে পরিচিত। পোড়ামাটির তৈরী এ সৈনিক দল ছাড়াও চারটি ভূ-গর্ভস্থ সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে। একেকটি সুড়ঙ্গে রয়েছে একেক ধরনের সৈন্য দল। সবচেয়ে বড় সুড়ঙ্গ রয়েছে গোলন্দাজ বাহিনী, দ্বিতীয় সুড়ঙ্গে অশ্বরোহী সেনা, তৃতীয় সুড়ঙ্গে রয়েছে সামরিক অফিসারদের দল। সর্বশেষ সুড়ঙ্গে সেনা সরঞ্জাম ইউনিট ছিল বলে ধারণা করা হয়। সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার হলো, সৈনিক মূর্তি একটি অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। চেহারা বা উচ্চতায় একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো মিল নেই। ঐতিহাসিকদের ধারণা, মৃত্যুর পর এ সেনাবাহিনী সম্রাট ও দেশকে রক্ষা করবে (!) এ অদ্ভুত বিশ্বাস থেকেই সম্রাট এই সেনা দল তৈরী করেছিলেন। এ পোড়ামাটির সেনা দলের কাছে রয়েছে সম্রাট কিনের সমাধি সৌধ। সম্ভবত এ পোড়ামাটির মূর্তিগুলো সম্রাটের সমাধির সঙ্গে কবর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে এ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনটি আবিস্কৃত হয়। ১৯৮৭ সালে ইউনিস্কো এটিকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট' হিসেবে ঘোষণা দেয়।

পরিচয় পাওয়া গেছে মোনালিসার!

জগদ্বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চির বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা'র পরিচয় নিয়ে কয়েক শতাব্দী ধরে চলা রহস্যের সমাধান করে ফেলেছেন বলে দাবি করেছেন একদল জার্মান বিশেষজ্ঞ। তারা দাবি করেছেন, ফ্লোরেন্সের ধণাঢ্য ব্যবসায়ী ফ্রাঞ্চেসকো ডেল জিওকন্ডোর স্ত্রী লিসা গেরারদিনি দেখতে ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর সেই বিখ্যাত প্রতিকৃতি মোনালিসার মতোই। তিনিই চিত্রকর্মটির প্রকৃত মডেল। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির বিশেষজ্ঞরা ১৫০৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, লিসাই লিওনার্দোর সেই বিখ্যাত সৃষ্টি মোনালিসার প্রকৃত মডেল। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়টির এক বিবৃতিতে বলা হয়, পান্ডুলিপি বিশেষজ্ঞ ড. আরমিনের আবিষ্কার চিত্রকর্ম মোনালিসার মডেলের পরিচয় নিয়ে সব সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে। মডেলের পরিচয় সংক্রান্ত সীমিত আলামতও পাওয়া গেছে বলে তারা দাবি করেছেন। সম্প্রতি লাইব্রেরির একজন মুখপাত্র জানান, ড. আরমিন ২ বছর আগেই এ আবিষ্কারটি করেন। সেটি লাইব্রেরির ক্যাটালগে ছাপানো হলেও বড় ধরনের প্রচার হয়নি। এর আগে মোনালিসার ছবির পরিচয় বের করতে যারা গবেষণা করেছেন তারাও মেনে নিয়েছেন হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এ তথ্য-প্রমাণ মোনালিসা রহস্য উন্মোচনে একটি বড় ধরনের অগ্রগতি।

সংগ্রহ: সুজন সেন ও মহুয়া (সূত্র: সমকাল)

"মাব্বলের মত দৃষ্টিনন্দিত না হয়ে
শালুক এর মত কুৎসিত হও।"
-নূরুল আমীন

শিরোনামহীন

সিদ্ধার্থ তালুকদার

পাথর ও মানুষের মধ্যে সম্পর্কিকরণের প্রাসঙ্গিকতা
এখন অপসৃত। যেহেতু মানুষ এখন পাথরের পরিপুরকতা
অর্জনে সচেষ্ট এবং পাথর সুনিপূণ ভাস্করের
ছেনির আঘাতে অংশত সচল! অতএব হে মানুষ হস্তপদ
চর্মচক্ষু সম্বলিত থাক তুমি মানুষ এবং পাথর তুমি হও
দুর্বিনীত স্থাণু। নেই কোন প্রয়োজন আজ আর তাই
পাথরে ও মানুষে আত্তীকরণে-আত্মার প্রয়োজনে।

মোনালিসা

মাসুদ চৌধুরী

লিওনার্দোর ক্যানভাস থেকে নেমে আসে মোনালিসা
হেঁটে
হেঁটে.....
কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে
ইতালী থেকে বাংলাদেশ,
তেমনি বিষন্ন মধুর মুখ
ঠোঁটে এক চিলতে হাসি
বোঝা যায় কি যায় না!
চোখে বিনম্র অনুরাগ
টানে
ভীষন টানে
টেনে নিয়ে যায়
কোন এক মিলনায়তনের
আলো, আঁধারে
যেখানে মঞ্চ
মঞ্চে আসন, যন্ত্র, যন্ত্রী, কুশলী
মোনালিসা গেয়ে ওঠে
ঠাকুরের গান
গান আর নারী
নারী আর গান
আহ্ কি মধুর অনুভব
এক কবি বসে বসে ভাবে
ভাবে আর মাথা দোলায়।

তিনটি কবিতা

হীরা সোবাহান

এক.
যখন দেখি-
আকাশ,
তখন দেখি-
মহাশূন্য।
যখন দেখি-
মাটি,
তখন দেখি-
মানব শূন্য।

দুই.
কালস্রোত কিংবা
ঘূর্ণিঝড়ের কাঙ্খিত উপাদান-
কালোরাত কিংবা,
গভীর অমাবস্যায়
আড়াল করা রূপালী চাঁদ-
এসব কিছুর সৌম্যতায়
সুখকর স্বপ্নতরী-
সমুদ্র জলস্রোতে ভাসমান,
ভাসমান তোমার-
শাড়ীর নীলাচল।

তিন.
কিছু দুঃখ
কিছু সুখের স্বপ্নডানা
কিছু স্মৃতির শহর
কিছু সমুদ্র সৈকতের নূড়ি,
কিছু বাহারী পল্লব-
কিছু উড়ন্ত দিশেহারা পাখির কান্না
কিছু সাদা কাগজে জলরঙে আঁকা-
অচিন গাঁয়ের বধূকূল
...প্রেম-ভিক্ষুকের আর্তনাদ
কষ্ঠিপাথরে করে পরখ।
কিছু শুদ্ধাচারী মননের ধ্রুব তারকা
আজ নিশাচর প্রহরী-
যেখানে আমি, তুমি, সে-
এক অভিনব খেলায় মাতি।

আত্মদহন

গোলাম ফারুক বেবুল

এক.
একি ভোর? নাকি রাতের সমুদ্দুর
ঐ যে দেখি পাখিরা সব মৃত সারি সারি
বাজিছে করুণসুর।

দুই.
আজ কোথাও কেউ নেই
নেই দিগন্ত চারিধার
আমি একা অসহায়
নির্বাক আকাশ তবু ঘননীল কুয়াশায়।

তিন.
আমরা সবাই মৃত হলাম
তবুও কাক চেয়ে থাকে
শকুনের আশায়।

সময়ের প্রার্থনা

লগন লাল দাসী

আস্থাহীন সময়ের পাঁজর ধরে
যে শিশু জন্ম নিলো-
এই নিকষ কালা রাতে-
তাকে হাজার খুনের রক্ত লাল শুভেচ্ছা!
আর, মার্কসীয় লাল সন্ত্রাসের অভিবাদন-
সর্বহারা ধরণী ধন্য হোক তোমায় করে ধারণ!
হে নবীন, সর্বনাশী
অরুণ-কোমল শুভ্রতা
তুমি হও পিয়াসী পৃথ্বীর ক্ষুধিত ঝান্ডা!
তুমি হও ক্ষুদিরামের, তিতুমীরের
তুমি হও ইলা মিত্রের
আর রাশান কমরেড তানিয়ার!
ধূলোমাখা ক্ষেতে রক্তবৃষ্টি ঝরাও-
সম্রাজ্যবাদের বুকে কর মৃত্যুর আয়োজন,
তৃতীয় বিশ্বের দেশে-দেশে ক্ষুধা আর দারিদ্র উড়াও!
এই পিয়াসী পৃথ্বীর তুমি হও প্রথম প্রয়োজন-
আস্থাহীন সময়ের পাঁজর ধরে আজ জন্মিলে যে জন!

অনুভবের চাঁদ

অন্তরীক্ষ

হাত বাড়ালেই চাঁদ ছোঁয়া যায় না যেমন
তেমনি চাঁদও হাজার মাইলের ব্যবধান মিটিয়ে
হাত ছুঁয়ে যায় না কখনো
তুমি আমার অনুভবের চাঁদ।
না ছোঁয়া যায়?
না ছুঁয়ে যায়?

একইভাবে

রাজু সরদার

আরও একটা দিন আমার কেটে যাবে
লোকাল ট্রেন হুইসেল দিয়ে যাবে
তার 'এ টান দিয়ে যাবে-
আমার বাউল মনে গান লেগে যাবে।
ক্ষুধার্ত কাক
সকাল-সকাল প্রদাহ ভুলে
কিছু ফুল পেয়ে যাবে।
দুপুর রাস্তা; বিটুমিন রাস্তা
আজ কিছু আগুন-রক্ত পেয়ে যাবে,
মহল্লার পোলাডার
আজ বড় ক্ষিদে পেয়ে যাবে
দুই টাকা-ছেঁড়া টাকা
ক্ষুধা ভুলে যাবে
যে যাবে সে পাবে লটারীতে
সব মিলে যাবে।
নাগরিক দেবদারু শোভা ভুলে মরে
বেশ্যার ইঙ্গিত সটান রাস্তায়
বেশ কিছু খদ্দের জুটে যাবে।
আজ সন্ধ্যায়
ঘর পেয়ে যাবে
সে কোন জন-নিজে ভুলে যাবে!
ইচ্ছেগুলো আজ পাখা মেলে উড়ে চলে যাবে,
সূর্য ডুবে ডুবে-রাত
ঘুম পেয়ে যাবে।

যখন তুমি এবং রাত্রী

স্বা ধী ন

ভোরের আলোর মত স্পষ্ট,
স্বচ্ছ নদীর জলের মত আমার ভালোবাসা
যখন অনুভব করলো শিশিরের শব্দ,
চারিদিকে তখন কুয়াশার ধোঁয়াটে
অনেকটা আবছা আমার সকাল,
ঠিক তোমার মত।
তারপরও...
সকল আনন্দ আমার, যখন
বিষন্নতার চাদরে ঢাকা
তখনও তুমি নও ।
ধীরে ধীরে তপ্ত রোদ্দুর যখন গ্রাস করলো
সমস্ত শরীর, এমনকি নক্ষত্র সমূহ আমার
কষ্টের শিশির যখন মাথা থেকে
স্পর্শ করলো পায়ের পাতা
তখনও তুমি নও।
কোলাহল থেমে যাওয়ার একটু আগে
শেষ বিকেলের সোনা রোদ্দুর
সমস্ত আকাশ যখন গিলে খেয়েছিলো
ঠিক তখনও তুমি নও।
যত্নে লালিত কষ্টগুলো যখন আমায়
ঘুনপোকার মত নিঃশব্দে কুড়ে খাচ্ছিল ,
বিষাক্ত ক্যাকটাসের তীক্ষ্ণকাঁটা যখন আমার বুকে
রক্তের প্লাবন এনেছিলো,
আমার আর্তনাদ যখন শিরা-উপশিরায়
ঢেলেছিল গলিত এসিড,
লোহিত বর্ণ যখন আমার ভেতরে-বাহিরে-
ঠিক তখনই তুমি এবং রাত্রী।

সহজাত

মা হ বু বু ল ই স লা ম

অভিশপ্ত প্রেম দিয়েছি তোমাকে
হৃদয়ের স্পর্শটাও ছিলো কন্টকাবৃত,
তোমার হাতে যখন স্বর্গীয় ফুল
তখন আমার হাতে বিষাক্ত কীট।
অসুস্থ মাতাল এক সুস্থ মানুষ,
মন আমার উড়ে বেড়ায় সর্বদাই আকাশের উপরে-
দশ ডানায় ভর দিয়ে।
কাঁদা মাটির শৃঙ্খল ত্যাগ করতে পারি না
বলেই বারবার ছিঁড়ে যাই হৃদয়ের মাঝ হতে।
শত সহস্র পথের কোনটাতেই খুঁজে পাইনা-
আমাকে তেমন
যতটা খুঁজি পথ ততটাই বিক্ষত করি প্রিয় ফুল।
নিষ্পেশিত ভালোলাগায় পড়ে আছি মুখ থুবড়ে,
অথচ ফুলের অবহেলা মৃত্যুর খুব কাছে নিয়ে যায়।
আমি পারি না প্রজাপতি হতে, কাঠবিড়ালী হতে,
যদিও প্রিয় প্রাঙ্গন ভরেছে ফুলে ফুলে।
ফুল হয়ে-ফুল হাতে একজন চেয়ে থাকে অনিমেষ
ছুঁয়ে দিতে চায় মন, ছুঁয়ে দেই।
মূহুর্তেই প্রাঙ্গনে শুরু হয়ে যায় উল্লাস,
আমারই ভুলে সব হয় পণ্ড, উলট-পালট।
পড়ে থাকি, ডানাহীন প্রজাপতি-সৌরভহীন ফুল হয়ে।
আবার ঢিমে তালে সাজাই বাগান,
উড়ে প্রজাপতি... ফুটে ফুল...।

সিডর

মোঃ হা বি বু ল্লা হ

মহাবিশ্বে হাহাকার
বিশ্বরমণী বিবস্ত্র আজ, ছিড়িছে কেশরাজি
ধিক্কার, ধিক্কার ওহে প্রলয় পবন
তুমি বিশ্বসুন্দরীর করেছো বস্ত্রহরণ
স্নান করিয়েছো বানে
বিশ্ব মানব ক্ষুব্ধ আজ
লজ্জিত মহাসৃষ্টি।

অলংকরণ: মেহেদী হাসান

ম ই নু দ্দী ন খা লে দ

দেবদাস চক্রবর্তীর বর্ণিল আলাপ

এদেশের চিত্রকলার ষাটের শতকের অন্যতম প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী গত ৫ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রতি রইলো অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। পঞ্চাশের দশকে বিমূর্ত ধারার চিত্রকলার একটা মহাপ্লাবন হয়। এই প্লাবনের জল জমতে শুরু করেছিল চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে, যুদ্ধোত্তর ইউরোপ ও আমেরিকায়। কানদিনিস্কির রঙিন উত্থান ও পল ক্লির বর্ণিল স্বরলিপি কোনোটিই শিল্পভূবনের প্রধান প্রবাহ হয়ে ওঠেনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে। বস্তুনিরপেক্ষ চিত্রায়ন, শিল্পেতিহাসের এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে লালিত শিল্পীদের হাতেই বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

দেবদাস চক্রবর্তী ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটের প্রথম প্রজন্মের শিল্পী। পশ্চিমী আধুনিকতার স্পর্শ–লাগা দেশে তখন বিমূর্তনের বেগ, কিন্তু দেবদাসের মনে ঘনিয়ে উঠেছে সামাজিক বাস্তবতার আবেগ। জ্যামিতিক বিমূর্তন, গীতিময় বিমূর্তন আর বিষয়ের অবয়বী উপস্থাপন এই তিন ধারায় আবিল স্রোত দেখে বিচলিত মনে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি; শিল্পের শৈলী আত্মজিঙাসা সমন্বিত করে গড়লেন নিজস্ব শিল্পভাষা। এই সময় তার চিত্রপটে ভেসে উঠলো প্রতিবাদে সোচ্চার সারি সারি মানুষের মুখ। আয়তাকার গড়নে ছক কাটা ক্যানভাস দেখে মনে হলো অগ্রসরমান শ্লোগান মুখরিক অজস্র প্ল্যাকার্ড। কিন্তু পরিণামে এসব উত্তেলিত চারকোণা বিন্যাসের শৈল্পিক খেলায় মজে গেলেন তিনি। ছবিগুলো তার এখন আবেগের মৃদু চাল, পেলব বর্ণের দেয়ালে মিহি রেখায় রচিত আকাঙ্খা ও খেয়াল। জ্যামিতিক ও নৈসর্গিক এই দুই বিন্যাসের মিশ্রমালা রচনা করেছেন শিল্পী। পরিপ্রেক্ষিত নিয়েছেন আকাশের ঘন নীলে। তার উপর জুড়েছেন স্পষ্ট লাল চৌখুপী। চারকোণা গড়নের নিষ্প্রাণ কন্টুর উপেক্ষা করে কখনো বর্ণের স্বাধীনতায় রূপগুলো ভেঙ্গে চুড়ে পরিপ্রেক্ষিতের নীলে বিলীন হয়ে গেছে। অধিকাংশ ছবিতে নিসর্গের মূল বিভাজন রেখাকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। নদী বা কোন জলময় পরিসর, তারপর বৃক্ষময় প্রকৃতি, শেষে প্রকৃতি স্পর্শ করেছে আকাশ, ছবির এই ভাষায় শিল্পী যে খুব উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন এমন বলা যায় না। নিসর্গের চেনা অনুসঙ্গগুলো বর্ণশ্রোতে মজ্জমান করার কৌশল একটি বহুচর্চিত বিষয়। আলোকময় ও দ্যূতিহীন রঙের বাতাবরণের দ্বিমাত্রিক ছবি নিরাবয়বী শিল্পের একটি প্রধান প্রবণতা। বিভিন্ন বর্ণের পারস্পারিক ঐক্য ও বিরোধের সমাচার রচনায় শিল্পী পারঙ্গম, কিন্তু এ ধারার কাজে তার স্বাতন্ত্রের সুষমা নেই কম্পোজিশন শীর্ষক

এদেশের চিত্রকলার ষাটের শতকের অন্যতম প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী গত ৫ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ রোগ ভোগের পর পরলোক গমন করেন। তাঁর প্রতি রইলো অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

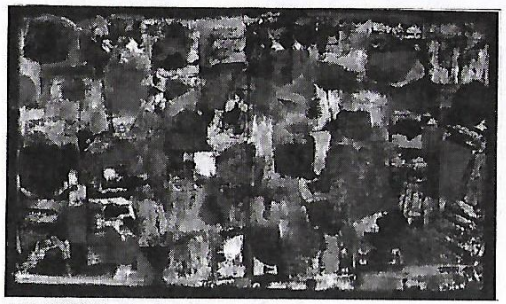

সময় ও মহাশূন্য

কাজগুলোতে, বর্ণের যেখানে ধ্বনিময় সুরেলা বিস্তার আছে, সেখানে দেবদাসের সৃষ্টিচেতনা বহুভঙ্গিমা সুন্দর রূপ পেয়েছে। তার চেতনা বিকাশে স্বাচ্ছন্দ্য পায় যখন তিনি প্রথম জীবনে শিল্পচর্চার কৌশলের কাছে প্রত্যাবর্তন করেন। সময় ও আবর্তন সিরিজের কাছে আবার উঁকি দিয়েছে মানুষের মুখ। সুমিত রেখার আয়োজনে আঁকা মুখগুলো বিভিন্ন দ্যোতনা এনেছে। চোখ, ভ্রূভঙ্গি, নাক,মুখ হলুদের ছোপ লেগে এখন কিছুটা বিমূঢ়, সময়ের আবর্তনে ক্ষয়িত; আগের সেই তেজীভাব নেই অবয়বে। হয়তো বিদ্রুপের স্পর্শ আছে প্রত্যক্ষ ভাষাকে আড়াল করে।

শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তীর অনেক কাজ অলঙ্কারে আকীর্ণ। এ দেশের মানুষের প্রকৃতিনির্ভর অবস্থানের সঙ্কেত ফোটে তার সৃষ্টিতে। অলংকারের অফুরন্ত উৎস প্রকৃতির বিচিত্র অনুষঙ্গ। পুরোপুরি নাগরিক কোনো শিল্পী নেই এ দেশে। অবয়বী কি নিরাবয়বী, দু'ধারার শিল্পীই কমবেশি প্রকৃতির অলঙ্কার বিলাসী। অবশ্য এ অলংকার দেশী চেতনার প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি যেখানে স্পষ্ট কোনো প্রকৃতির অনুষঙ্গ থাকে না, থাকে শুধু কিছু অন্তর্লীন সুর ও রেখা অথবা বর্ণের উদ্ভাসন, সেখানেও সুনির্দিষ্ট ভূখন্ডের সংরাগ ফুটে ওঠে। কিন্তু মন্ডনধর্মীতার সঙ্গে প্রেম ও বুদ্ধির বাঁধন যোজিত না হলে শিল্প হয়ে ওঠে কেবলি নিস্প্রাণ অলঙ্কার, চারুহীন কারুময় সংগঠন। সংগঠনের মধ্যে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন শিল্পী দেবদাস। অনেক অলঙ্কার গেঁথেছেন একটি বৃত্তাকার লাল ঘেরাটোপে। লাল ঘেরাটোপ ভাসমান হয়ে উঠেছে সাদা বর্ণতলের নীড়ে আর সাদা বর্ণতল চৌকোণা নীলে বন্দি। এভাবে জ্যামিতিক গড়ন নিসর্গের প্রেমে মুক্তি পেয়েছে গাণিতিক কানুন থেকে অথবা বলা যায় প্রকৃতির অন্তর্লীন ব্যাকরণে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে শিল্পীর হাতে। কোনো বস্তুর ব্যবচ্ছেদে যেমন মধুর আলো ও অনেক চুর্ণিত রেখা ও টেক্সচার বেড়িয়ে আসে, ঠিক সেভাব অলঙ্কার আবিষ্কার হয়েছে এ শৈল্পিক কাজে।

শিল্পী নীলে সমর্পিত হয়ে অস্তিত্বের সব আব্রু উন্মোচিত করেন। সময়ের বিবর্তিত রূপগুলো প্রকাশ করেন। কেনো কোনো কাজে নিজেকে দেখেছেন ভাঙা দর্পণে। মৃৎপাত্র ভেঙ্গে গেলে যেমন অনেক আকারের টুকরো পাওয়া যায় এবং সেই সব টুকরোতে লেগে থাকে এক অখন্ড বিন্যাসের চুর্ণিত রূপ। টুকরোগুলো সেঁটে দিয়ে যেন এক লুপ্ত সময়ের গান গেয়েছেন শিল্পী। ফুলেল প্রকাশ, পত্রালীর বিকাশ, জাফরি-কাটা জেল্লা এসবের মধ্যে বিম্বিত করেছেন শিল্পিত সত্তা। খন্ডিত আকারগুলো নীলে ভাসছে বলে মন্ডনধর্মিতা প্রকৃতির মতোই সজীব বোধে আলোড়িত করে আমাদের। তার অন্তিম সংযোজন বৃষ্টির শব্দ। হালকা নীল ছবির নীচের দিকে ক্রমশ ঘনায়মান হয়ে উঠেছে। এই নীল তলের ওপর সফেদ বর্ণবিন্দুর ধারাপাত অর্থাৎ বৃষ্টিপাত। বৃষ্টির ফোটা ভূমি স্পর্শ করেই এক রঙিন স্বরে কথা বলে উঠেছে। জলের উপর জল পড়ে বলয়ের ভিতরে বলয় সৃষ্টি হয়েছে। কিংবা কখনো মনে হয় লাল বলয় ঘেরা সবুজ গড়নগুলো বৃষ্টির শব্দে ধ্বনি-প্রতিধ্বনিময় কোনে নৈসর্গিক সুখের একক হয়ে উঠেছে। একই বিষয় আরো স্নিগ্ধ অধ্যাস দিয়ে জমিয়ে তুলেছেন শিল্পী।

বৃষ্টি-শীর্ষক কাজে কখনো বা বৃষ্টি প্রকৃতির ওপর বিভিন্ন বর্ণিল সুঁতোর তাঁত বুনেছে। আনুভূমিক রেখা দিয়ে বিভাজিত হয়েছে সেই বস্ত্রের জমিন। নীল, লাল, ফিরোজা, কালো বিভিন্ন বর্ণপর্দা মৃদু কিন্তু সমস্বরে কথা বলে যাচ্ছে। এই কাজটিতে অলঙ্কারের গ্রন্থনা নেই বললেই চলে; বরং রঙ এখানে শুদ্ধ স্বরে কথা বলেছে। ছবির সাঙ্গিতিক গুণ সহজেই শিল্পানুরাগীদের মোহিত করবে। মনে হয় আমাদের অলঙ্কারবন্দি শিল্প এভাবে মুক্তির পথ খুঁজলে ভালো হবে। প্রথাকে অতিক্রম করে চলে বিকাশের উন্মুখতা। সেই সত্য এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিশু মনের খুশির মতো রঙের সন্নিপাতে।

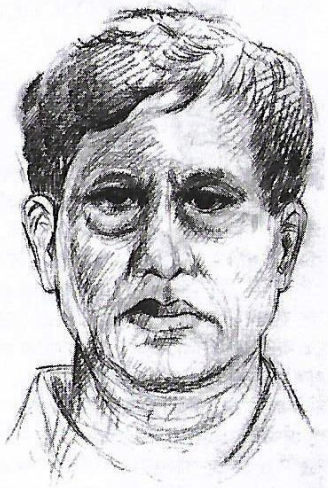

অলংকরণ: তারেক ইকবাল

মা সু দ চৌ ধু রী

নাট্যকার সেলিম আল দীন এর নাটকীয় প্রস্থান

গত ১৪ জানুয়ারি এদেশের নাট্যাঙ্গনের প্রাণপুরুষ সেলিম আল দীন জীবনের নাট্যমঞ্চ থেকে মহাপ্রস্থান করেন। তাঁর প্রতি রইলো আমাদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধাঞ্জলি।

স্বাধীনতা পূর্বে অবহেলিত কিন্তু অন্যতম শক্তিশালী যে শিল্প মাধ্যমটি মহান মুক্তিযুদ্ধের পর অমিত সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের আলোড়িত করলো তা হচ্ছে নাটক। আমরা পেলাম অপূর্ব শব্দ যুগল গ্রুপ থিয়েটার। অনিয়মিত সৌখিন নাট্যচর্চার বিপরীতে নিয়মিত, অঙ্গীকারাবদ্ধ, সিরিয়াস নাটক। গঠিত হলো অনেক নাট্যদল। নাটক রচনা থেকে মঞ্চায়ন পর্যন্ত যাবতীয় কর্মকান্ড দলীয় সদস্যদের দ্বারা সম্পাদিত হবে মূলতঃ এই লক্ষ্য নিয়ে শুরু হলো বাংলাদেশের গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন। এই মহতী কর্মকান্ডের প্রথম দিকের এবং প্রথম সারির অন্যতম দল ঢাকা থিয়েটার। আল মনসুর, রাইসুল ইসলাম আসাদ, হুমায়ূন ফরিদী, আফজাল হোসেন, পীযূষ বন্দোপাধ্যায়, সুবর্ণা মোস্তফা, শিমুল ইউসুফ সহ অনেক নাট্য তারকার সূতিকাগার। মনি কাঞ্চন রূপে আবির্ভূত হলেন এ দলেরই নাট্য নির্দেশক নাসির উদ্দিন ইউসুফ ও নাট্যকার সেলিম আল দীন। যুগল বাদনের অপূর্ব ঐকতান। এ ঐকতানের বহতা ধারায় আমরা চিনে নিলাম নাট্যকার সেলিম আল দীনকে। মৌলিক নাট্য রচনার পাশাপাশি স্বতন্ত্র নাট্যরীতির ধারক ও বাহক। ক্রমে ক্রমে জানা হয় ব্যাক্তিটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কৃতি শিক্ষক। নাটক অন্তঃপ্রাণ সেলিম আল দীন নাটককে বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য গ্রাম থিয়েটার গঠনে রাখেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মূলতঃ তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় নাটক ও নাট্যতত্ব বিভাগ। নাটককে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়ে পরিণত করার অন্যতম রূপকার।

সেলিম আল দীন আপনার অকাল প্রয়াণে ক্ষতিগ্রস্ত হলো স্বদেশ। আমরা আপনাকে হারালাম। বঞ্চিত হলাম আরো অনেক প্রাপ্তি থেকে। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে এসেছিলেন আপনি। এই বিভাগেরই এক তরুণ শিক্ষককে সহাস্যে বলেছিলেন 'অটোগ্রাফ নিলে না?' সেটা কি আর কেউ কোনদিন সুযোগ পাবে না বলে!

আপনার আত্মার শান্তি কামনা করি। আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন ॥

ভাষা সৈনিক এ্যাড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন–

'ভাষা সৈনিকদের স্বপ্ন আজ ভুলণ্ঠিত'

বাঙালির হাজার বছরের ঐতিহ্য তার ভাষা সংস্কৃতি, কৃষ্টি রক্ষা ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার যে স্বপ্ন নিয়ে ভাষা সৈনিকরা লড়াই সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন তা আজ ভুলণ্ঠিত। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাসও সকলের কাছে অজানা। "চেতনায় একুশ" এর আহ্বায়ক ভাষা সৈনিক এ্যাড. আব্দুর রাজ্জাক সাক্ষাৎকালে এ কথা জানান। ৫২'র ভাষা আন্দোলনের সময় এ্যাড. আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। ঢাকা শহরের মতন রাজশাহীতেও মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠতে থাকে। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহামেদ, ভাষা সৈনিক এ্যাড. গোলাম আরিফ টিপু, ডাঃ এস.এম.এ গাফফার, ডাঃ আব্দুল লতিফ, মোহাসিন প্রামানিক, সাইদ উদ্দিন আহমেদ, আবুল হোসেন প্রমূখ তাঁদের অনেকেই আজ আর জীবিত নেই। সে সময় আমরা বিকেল বেলা রাজশাহী কলেজ মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যেতাম, খেলার শেষে বিভিন্ন ধরনের গল্পের মাধ্যমে নাট্যকার মমতাজ উদ্দিন আহামেদ আমাদের পূর্ব পাকিস্থান ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে যে বৈষম্য ছিল তা তুলে ধরতেন। ৫২'র ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষার দাবীতে চলমান আন্দোলনে পুলিশী গুলির খবর বেলা দশটায় রাজশাহীতে আসে। মূহুর্তের মধ্যে ছাত্ররা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিকেল তিনটার দিকে কলেজিয়েট স্কুল থেকে একটি মিছিল বের হয়। স্কুল ছাত্র হিসেবে আমিও সেই মিছিলে যোগ দেই। মিছিল শেষে বিকেলে আমরা রাজশাহী কলেজে উপস্থিত হই। রাজশাহী কলেজ হোস্টেলের ৩য় ব্লকে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা এক আলোচনায় বসে। আমরা সকলে উদগ্রীব হয়ে বড় ভাইদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় ছিলাম। রাত ৯ টায় সিদ্ধান্ত হয় রাজশাহী কলেজ হোস্টেলে ঢাকায় নিহত শহীদদের স্মরণে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করা হবে। সে সময় শহীদ মিনারের ধারণাটা ছিলনা। আমরা যারা ছোটরা উপস্থিত ছিলাম তারা বড় ভাইদের নির্দেশে ইট বয়ে নিয়ে এসে কাদা দিয়ে গেঁথে একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করি এবং একটি কাগজে লেখা হয় বিখ্যাত কবিতা-

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

আমরা যখন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করি তখন বাইরে পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছিল। কিন্তু তখন প্রতিষ্ঠানের প্রধানের অনুমতি ছাড়া কোন আইন-শৃংখলা বাহিনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে পারত না। স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী শেষে রাত ১২ টার দিকে চলে আসি। এরপর তৎকালীন ভাষা আন্দোলন বিরোধীরা স্মৃতিস্তম্ভটি গুড়িয়ে দেয়। এই শহীদ মিনারটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম শহীদ মিনার যা রাজশাহীবাসী সহ অনেকের কাছেই অজানা। তিনি আরও বলেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলনের রাজশাহীতে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন তাঁরাই পরবর্তীতে ভাষার দাবির এই আন্দোলন শহর থেকে গ্রামে গঞ্জেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর শহর থেকে গ্রাম গঞ্জেও ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করার পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন মরহুম আতাউর রহমান। ৫২'সনে ভাষা আন্দোলন রাজশাহীর গ্রাম পর্যায়ে সংগঠিত করার জন্য রাজশাহীর নওহাটা, বাগমারার তাহেরপুর, বাঘার আড়ানি সহ গ্রামে গঞ্জে মিটিং হয়েছে। সেই সময় শহর থেকে গ্রামে যাওয়া ছিল খুব কষ্টের। টমটমে যেতে হতো। কখনো পায়ে হেঁটেও যেতে হয়েছে। ভাষা সৈনিক এ্যাড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, ৫২'র ভাষা আন্দোলন বাঙালির সকল লড়াই সংগ্রামের অনুপ্রেরণা। ৫২'র পথ ধরেই পরবর্তীতে ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ১১দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণ অভ্যুত্থান সর্বোপরি ৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধ ও ৯০'র স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে বাঙালি মাথা নত না করে তার দাবী আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু ভাষা সৈনিকরা আজও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাননি ও বর্তমান প্রজন্মকে বিকৃত ইতিহাস উপহার দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, তাঁদের স্বপ্ন ছিল শোষণ মুক্ত, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার যেখানে প্রতিটি মানুষ তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মাথা নত না করে জীবন ধারণ করবে। কিন্তু তাঁদের সেই স্বপ্ন-সাধ আজও পূরণ হয়নি। তাই তিনি নতুন প্রজন্মকে আহ্বান জানান একুশের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে কাঙ্খিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য।

অনুলিখন: রফি আহমেদ

বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আর্ট গ্যালারী

বেঙ্গল গ্যালারী অব ফাইন আর্টস
বাসা–২৭৫/এফ, সড়ক–২৭, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন: ৮১২৩১১৫

বি.পি.এস সেক্রেটারিয়েট গ্যালারী
৬৩/২ (নিচতলা),
সাইন্স ল্যাবরেটরি রোড, ঢাকা।
ফোন: ৮৬১১২৮৪

সিজান আর্ট গ্যালারী
ঢাকা শেরাটন হোটেল, ঢাকা।
ফোন: ৮৬১৩৩৯১

দৃক গ্যালারী
বাসা–৫৮,সড়ক–১৫/এ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন: ৯১২০১২৫

গ্যালারী চিত্রক
বাসা–২১, সড়ক–৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ৮৬২০৩৪৫

শিল্পরাগ
বাসা–১৫, সড়ক–১৬, ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন: ৮১১৭০৮৫

ডিভাইন আর্ট গ্যালারী
সোনারগাঁও প্যানপ্যাসিফিক হোটেল
ঢাকা।

জয়নুল গ্যালারী
চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যা
শাহবাগ, ঢাকা।

রুশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
বাড়ি–৫১০,সড়ক–৭,
ধানমন্ডি–আ/এ, ঢাকা।
ফোন: ৯১১৬৩১৪

জাতীয় চিত্রশালা
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী
সেগুন বাগিচা, রমনা, ঢাকা–১০০০।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ গ্যালারী অব ফাইন আর্টস
৫, পুরাতন সচিবালয় রোড,
নীমতলা, রমনা, ঢাকা–১০০০।
ফোন: ৭১৬৮৯৪০

গ্যালারী শিল্পাঙ্গন
বাড়ী–২৬, রোড–৩, ধানমন্ডি, ঢাকা–১

সাজু আর্ট গ্যালারী
ডি.সি.সি নর্থ সুপার মার্কেট,
দ্বিতীয় সার্কেল,গুলশান, ঢাকা–১২১২।

আর্ট কালেক্টর, সমকালীন আর্ট গ্যালারী
বি.এন.এস সেন্টার, শপ: এ–৭/৮, প্লট
সেক্টর–৭, উত্তরা, ঢাকা–১২৩০।
ফোন: ৮৯১৫৫৮৬, ০১৮৯২১৪৬১১

গ্রন্থনা: লাফিজা নাজমীন

কার্টুনচিত্র

পিঠা উৎসবে...

আঁকা: বিপ্লব দত্ত, লেখা: মামুন

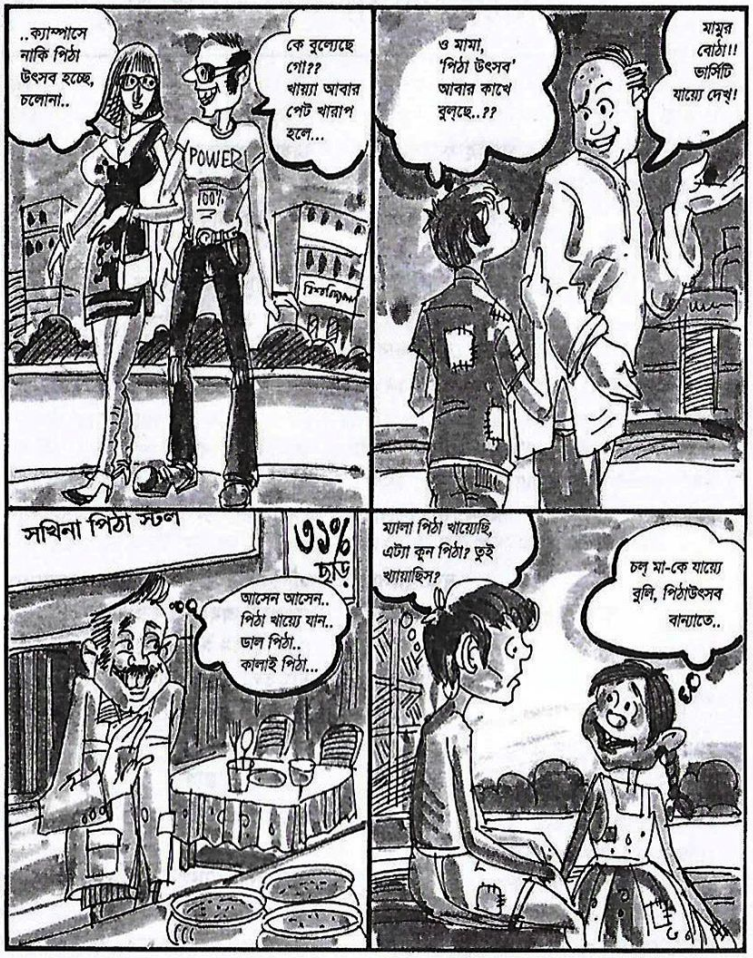

'এবঙ' পরবর্তী সংখ্যায় আপনার সৃজনশীল লেখা আমরা মূল্যায়ন করতে চাই –

: যোগাযোগ ও লেখা পাঠানোর ঠিকানা :
সম্পাদক 'এবঙ', ২৬/১২২, মেহেরচন্ডী পূর্ব পাড়া (বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশন সংলগ্ন), রাজশাহী।
মুঠোফোনঃ ০১৭১৬৩৮১৫৩৪, ০১৭১৮৩২০০৬, ০১৭২১৩৮১৪৪৯; ই-মেইলঃ info_abong@yahoo.com

শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি বিকশিত হোক শতধারায়..
'এবঙ' এর পথচলাকে সাধুবাদ জানাই।

জ্ঞানভিত্তিক জাতি গঠন আমাদের লক্ষ্য
অগ্রযাত্রার দু'যুগ বিশ্ববিদ্যালয়
ক্যাম্পাস
শিক্ষা ও যুব উন্নয়নমূলক নিয়মিত পত্রিকা
মেহেরবা প্লাজা (১৩ তলা), ৩৩ তোপখানা রোড, ঢাকা - ১০০০
ফোন: ৯৫৬০২২৫, ৯৫৫০০৫৫, ফ্যাক্স: ৭১৭৪২৭০

'এবঙ' এর প্রারম্ভিক যাত্রা শুভ হোক...
নিউ হার্ডওয়্যার ম্মার্ট
মেসার্স শ্রাবণ ট্রেডিং কর্পোরেশন
মালোপাড়া, সাহেব বাজার, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১২০০১৪১৪
সকল ধরনের রং ও হার্ডওয়্যার সামগ্রী বিক্রেতা

'এবঙ' এর অগ্রযাত্রা সফল হোক...
সর্ব প্রকার অফিস স্টেশনারী কাগজ পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মোঃ মনিরুজ্জামান লাকী
০১৭১১-৩৫১৯৭৭, ০১৫৬-৩১৫০৭৩
মোঃ শফিকুল ইসলাম রতন
০১৯১-১৩৭৬৭৮
RS
রাজশাহী স্টেশনারী
৫ নং সমবায় সুপার মার্কেট, মালোপাড়া, রাজশাহী।
ফোনঃ 772668 (Shop), 775053 (Chamber)